# দুর্বার ভাবনা

বর্ষ : ৪ সংখ্যা : ১১ □ মার্চ ২০১৩

সূ চি প ত্র

স ম্পা দ কী য় ... উধাও ভালোবাসা ...১
প্র চ্ছ দ নি ব ন্ধ : প্রে ম- ক থা
লভ্-হোটেল : জাপানে যৌন বিলাসের আধুনিক...মিত্রা মুখোপাধ্যায়...৪
প্রেম যে কী তা ... অনামিকা সেন ... ৬
বি শে ষ নি ব ন্ধ : ব্রা ত্য জ ন - ক থা
শবর... অনিলকুমার চৌধুরী ... ৮
বি শে ষ নি ব ন্ধ : জি ন প্র যু ক্তি
কৃষি সংকট ও জিন প্রযুক্তি... দেবীন্দর শর্মা ... ১১
বি শে ষ নি ব ন্ধ : শি ক্ষা ও রা জ নী তি
শিক্ষা, বৈষম্য এবং রাজনীতি... ব্রতীন চট্টোপাধ্যায় ... ১৭
বি শে ষ নি ব ন্ধ : ও ষু ধ ও চি কি ৎ সা
ওষুধের নাগাল মিলবে কবে, কিভাবে... শুভজিৎ ভট্টাচার্য ... ১৯
অ সু খ বি সু খ - রো গ বা লা ই
ব্যথা যখন কোমরে... পুণ্যব্রত গুণ... ২৫
সং বা দ : বি শ্বে - দে শে - রা জ্যে - ন গ রে - গ্রা মে
বাচ্চাদের জন্যে ঘি একটি ... ২৭ ওষুধে আসক্তি বাড়াচ্ছে ...২৭
ওষুধে আসক্তি বাড়াচ্ছে ... ২৮
কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তায় পশ্চিমবঙ্গ এখনও পিছনের সারিতে ... ২৯
কুড়ি ঘণ্টার বেশি টিভি দেখা, বাড়িয়ে দিচ্ছে পুরুষের বন্ধ্যাত্ব ... ৩০
দম্পতি নয় ভাইবোন হয়েই থাকতে হবে ... ৩০
রি পো র্ট / প্র তি বে দ ন
EIMF-এর বিশ্ব এইড্স দিবস উদ্যাপন... ৩০
কলকাতা মিলন মেলার বই মেলায় ... ৩১
ডা কে র চি ঠি .... পৃথিবীর আদিমতম ভণ্ডামো ... ৩২

প্র চ্ছ দ : তরুণ বসু। ছ বি ঋ ণ স্বী কা র : গুগলস-এর বিভিন্ন সাইট।

মু দ্র ণ : রে'জ ডট কম, ৪৪/১, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

**DURBAR BHABNA**
New Declaration No 1/12 & 2/12 as on 2. 1. 2012
Vol. 4 No.11 □ March, 2013
Editor : Dr Smarajit Jana
Publisher : Bharati Dey
Address : 12/5 Nilmani Mitra Street, Kolkata 700 006 WB INDIA
Phone : 033 2543 7560/7451 Fax : 033 2543 7777 e mail : sonagachi @sify.com URL : www.durbar.org

স ম্পা দ কী য়

## উধাও ভালোবাসা

পারিবারিক আর সমাজ জীবন থেকে কি প্রেম, ভালোবাসা ক্রমশ বিলীন হয়ে আসছে? নইলে এত ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ভ্যালেটাইন ডে উৎযাপন করার প্রয়োজন বোধ হয় ঘটত না। দ্রুতগতির এই জীবনে, ইঁদুর দৌড়ের কারসাজিতে সমাজটা আমাদের এমন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে যে অনেকের পক্ষেই আজ এমনকি তার কাছের মানুষের কাছে মনের কথা খুলে বলবার আর ফুরসৎ পাচ্ছেন না। সেখানেও চলে এসেছে নানান ধরণের হিসেব-নিকেশ, সময়ের হিসেব, কাজের হিসেব, পয়সার হিসেব। আরও কত কি? সত্যি বলতে কি এর মধ্যে কি আর প্রেম হয়? প্রেম সেই ফাঁকে কখন যে মনের জানলা গলে পালিয়ে যায় খেয়ালই পড়ে না। এতসব সত্ত্বেও যারা প্রেম করেন, প্রেমে মাতোয়ারা হন— তাদেরকে বরং দলছুট বলে ধরে নেওয়াই ভালো। মূল সমাজের ধারা প্রকৃতির সঙ্গে এই সব প্রেম-ভালোবাসা কেমন যেন খাপ খায় না। তাই হয়তো এখন নিটোল প্রেম খুঁজে বেড়াতে হয় উপন্যাসের পাতায়, নায়তো রুপোলি পর্দায়। যৌবনের টানে মনের কোণে প্রেম জন্মালেও লেখাপড়া, আর কেরিয়ার গড়ার চাপে অচিরেই সে-সব চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যায়। এছাড়াও রয়েছে পরিবার থেকে স্কুল, কলেজ এমনকি পাড়ার দাদা-ভাইদের শাসন, অত্যাচার। ফলে প্রেম-ভালোবাসা এমনকি বন্ধুত্বের সম্পর্কগুলো এই সমাজে ক্রমশ একটি অতিরিক্ত কখনও বা অপ্রয়োজনীয় বিষয় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যাচ্ছে, বা হতে চলেছে। কাজ, কাজ আর কাজ— কাজ না করলে উপার্জন নেই। রোজগার না বাড়লে ব্যক্তিজীবন তথা পরিবারে উন্নতি ঘটানো যাবে না। তাই স্কুলের শুরু থেকেই বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন, শিক্ষক-শিক্ষিকা সবাই নিরন্তর চেষ্টা করে যান বইয়ের বাইরে পড়ুয়ারা যেন অন্য কিছুতে না জড়ায়। এমনকি খেলাধুলো, গল্পগুজব, হাসি-ঠাট্টা সে সবও নৈব নৈব চ। পরীক্ষার খাতায় নম্বর পাওয়ার প্রতিযোগিতায় ছেলেমেয়েদের

কিভাবে বইয়ের পাতায় আটকে রাখা যায় তারই কসরৎ চলে। তাকে শেখানো হয় নিজের পায়ে দাঁড়াতে গেলে তাদের কিরকম স্বার্থপর হতে হবে, অনুভূতি-আবেগের জায়গাগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে চুরমার করে দিতে হবে। বন্ধুদের লুকিয়ে নিজের টিফিন খেতে হবে। ক্লাসের পড়া কেউ বুঝতে না পারলে, বা সে ক্লাসে কোনো কারণে যেতে না পারলে সহপাঠীরা কেউ তাকে সাহায্য করবে না। নিজে কিছু শিখলে, জানলে অপরকে সে ভাগ দেবে না। ছেলেমেয়েদের হতে হবে ভাবলেশহীন, বিবেক বিবেচনা বহিভূত এক জীব যে কিনা রোবটের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে। অন্যকে সাহায্য করা, সবার সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া, ভালোবাসা, ভালোলাগার সম্পর্কে যুক্ত হওয়া, ক্রমশ এখন পিতামাতা থেকে শুরু করে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে 'অচিন্ত্যনীয়' বিষয় হিসেবে পরিচিত হচ্ছে। এ নিয়ে অবশ্য আমাদের কারুরই মাথাব্যাথা নেই। প্রেম-ভালোবাসা হীন আমাদের এই সব পরিবারে-সমাজে যে সব ছেলেমেয়েরা বেড়ে উঠছে, যে ভাবধারায় তারা মানুষ হচ্ছে, তা কি আগামী প্রজন্মের জীবনযাত্রায়, সমাজকাঠামোয় পরিবর্তন আনবে না? মানুষে মানুষে সম্পর্কের আদলে কি চিত্র উঠে আসবে? আগামী প্রজন্মের সমাজকাঠামোটাই কি ধরণের আকৃতি নেবে?

অনেকেই হয়তো ভ্রু কুঁচকে বলবেন, কি যে বলেন, দেখেননি ভ্যালোটাইনের দিনে ছেলেমেয়েরা কিরকম বেলেল্লাপনায় মেতে ওঠে। সে বছর তো প্রায় এক ডজন ছেলেমেয়েকে পুলিশ পার্ক থেকে তুলে নিয়ে গেল। তারা সরব হন এই বলে যে, আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতিতে শ্লীলতা, শুচিতার একটা জায়গা ছিল। এসবই তৈরি হয়েছে পাশ্চাত্যের প্রভাবে, পৃথিবী জোড়া পণ্যায়নের এ এক বিষম ফল। আমাদের সংস্কৃতিতে কি ছিল আর ছিল না তা বুঝতে বেশি সময় লাগার কথা নয়। আমরা রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার বিষয়ের সঙ্গে সবাই কমবেশি পরিচিত। পরিচিত আমরা আমাদের প্রাচীন বহু কাব্য, সাহিত্য, সংগীত কিংবা ভাস্কর্যের সঙ্গে। যেখানে প্রেম ভালোবাসা নিয়ে বিস্তর ঘটনা, বিবরণ রয়েছে। প্রেম ও যৌনতার চিত্র ও ভাস্কর্যের কোনো খামতি আমাদের প্রাচীন কৃষ্টিতে ছিল না। তবে সে আলোচনায় না ঢুকে প্রথমেই প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে কোন্‌টা রুচিশীল আর কোন্‌টা নয়, সে-সব ঠিক করে দেবার হক্ কি রয়েছে পুলিশের? গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কি সেই এক্তিয়ার পুলিশকে দিয়েছে? দিকে থাকুক অথবা না থাকুক এটা বুঝতে অসুবিধে হয় না যে পুলিশের এই অতি তৎপরতার পেছনে সমাজের একটা প্রচ্ছন্ন সায় আছে। আর তা আছে বলেই যে পুলিশ চোর, ডাকাত এবং ক্রিমিনালদের পাকড়াও করতে এবং তাদের শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে সাধারণ ভাবে অনিচ্ছুক, অক্ষম কিংবা অপারগ; তারাই বীর-বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েন প্রেমিক প্রেমিকাদের উপর। তাহলে কি ধরে নিতে হবে প্রেম, ভালোবাসা এক রাষ্ট্রবিরোধী কাজ? একে অপরকে ভালোবাসা জানানোর এই রীতি এক অপরাধমূলক বিষয়? অনেকে হয়তো প্রশ্ন তুলবেন রুচিশীলতা, শালীনতা ইত্যাদি শব্দের ব্যবহারের মাধ্যমে। কিন্তু সে-সব মাপকাঠি কে কি ভাবেই বা ঠিক করে দেয়?

এটা তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আমাদের সমাজ পাল্টাচ্ছে, নানান ধরণের পরিবর্তন এসেছে-আসছে, আমাদের জীবনযাত্রায় এবং আমাদের চিন্তাভাবনায়। নতুন প্রযুক্তির প্রভাবে জীবনের গতি যে ভাবে বেড়েছে এবং সঙ্গে তুলে এনেছে নানান বৈচিত্র্য ও নতুনত্ব যা দু'দশক আগেও কল্পনা করা যেত না। আজকের দিনে কেউ কি ভাবতে পারেন মোবাইল ফোন, টিভি, ইন্টারনেট ছাড়া দিনযাপনের কথা। সেখানে ভালোবাসা প্রকাশের চালচিত্রে যদি পরিবর্তন এসেই থাকে কি এমন তাতে 'অপরাধ' ঘটে যায়? কারুর যদি বর্তমান কালের যুবক যুবতীদের প্রেম, অনুভূতি প্রকাশের বিষয়টা রুচিশীল মনে না হয়, তিনি তাহলে সেদিকে তাকাবেন না, সে রাস্তায় হাঁটবেন না, তাহলেই তো ল্যাটা চুকে যায়। আর সমাজ পাল্টালে সমাজের রুচি-অরুচি তথা সংস্কৃতির বিষয়গুলোও পাল্টে যায়, কারণ তা পাল্টাতে বাধ্য। তাই পুরোনো মাপকাঠিতে (যদি সর্বজন-স্বীকৃত তেমন কোনো মাপকাঠি থেকে থাকে) সেগুলোকে মাপতে হবে কেন? আর কেই-ই সে অধিকার দিয়েছে সরকারকে কিংবা পুলিশকে? কেউ হয়তো বিষয়টাকে একটু জটিল করার জন্য বলবেন সন্ধ্যেবেলা জগিং করার জন্য পার্কে যখন যেতে হয় এবং সেখানে যদি ছেলেমেয়েরা ঘনিষ্ঠ ভাবে বসে থাকে তখন তো তা চোখে পড়বেই, অতএব এসব 'দুরাচার' বন্ধ করতে পুলিশের ডাক পড়ে যায়। এই সব বক্তব্যের সপক্ষে অনেককেই সওয়াল করতে দেখা যায় কারণ তাদের নিজ বিশ্বাস ছাড়াও কাজ করে এক অহংবোধ ও অপরের ব্যবহার, রুচি ইত্যাদির প্রতি গভীর অসহিষ্ণুতা। এখন তো শুধু পুলিশ নয় পুলিশের সঙ্গে মদত দিতে ময়দানে হাজির থাকে আধা কিংবা সিকি মাপের উর্দিপরা ধর্মীয় তথা রাজনৈতিক দল বা দলের লেজুড়ধারীরা, তারা নাকি এসব কুরুচি বন্ধ করতে এবং সুসংস্কৃতি কায়েম করতে ভীষণ রকমের তৎপর। এদের অনেকে আবার রামরাজত্ব কায়েম করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে প্রেম-ভালোবাসা রুখতে শুধু এই দক্ষিণপন্থীরাই নয় বহু রংয়ের বামপন্থীরাও পিছুপা হন না। কারণ তাদের রাজনৈতিক আদর্শ এবং বিপ্লব ইত্যাদির সঙ্গে নাকি প্রেম-পরিণয়ের বিষয়গুলো মিল খায় না, বিপ্লব আর প্রেম নাকি আদা-কাঁচকলার সম্পর্কের মতো, কিছুতেই তাকে মেলানো যায় না। এ নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুললে তখন তাকে 'অপসংস্কৃতির দালাল' বলে চিহ্নিত করা হবে। সেদিক থেকে বিচার করলে প্রেম, ভালোবাসার বিষয়ে বজরঙ্গবলী, তালিবান কিংবা একশ্রেণির 'বিপ্লববাদীরা' প্রায় সবাই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

ভাবতে অবাক লাগলেও কিন্তু এটাই বাস্তব ঘটনা, এদেশে খাপতন্ত্রের নিয়মনীতি না মেনে প্রেম, পরিণয়ে যুক্ত হলে সেটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে তারা গণ্য করেন। আর এর শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড। অবশ্য এই সব মৌলবাদীরা সেসবকে 'সম্মানীয় হত্যা' বা 'অনার কিলিং' হিসেবে প্রচার করেন আর এ ব্যাপারে হিন্দু, মুসলিম থেকে শুরু করে অধিকাংশ ধর্মে এই অনার কিলিং বিষয়টা এখনও চলে আসছে, বহু ধর্মীয় নেতানেত্রীদের এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ সায় রয়েছে, তা না হলে ধর্মের নামে এ ধরণের জঘন্য ঘটনা দিনের পর দিন ঘটে চলত না। নীতিবাগীশরা অবশ্য বলবেন, ধর্মপুস্তকে এসব লেখা নেই, এসবই ব্যতিক্রমী ঘটনা কু-লোকেরা এসব কাজ করে থাকেন। অন্যদেশের কথা বাদ দিলাম আমাদের দেশে হিন্দুধর্মের নেতানেত্রীদের এ

ব্যাপারে কখনও তো সোচ্চার হতে দেখা যায় নি। এমনকি যারা নিজেদের সমাজ সংস্কারক এবং ধর্মগুরু বলে প্রতিষ্ঠা পান বা পেয়েছেন তারাও এ ব্যাপারে নীরব। কারণ কি এই যে, প্রেম-ভালোবাসায় জড়িয়ে রয়েছে এ বিষয়টাকে ঘিরে কিছু কূট বিতর্ক? আমরা সে সব বির্তকে না জড়িয়ে ভালোবাসার প্রসঙ্গে বরং ফিরে যাই। ধর্মের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র কি করে এসবের প্রচ্ছন্ন মদত দিয়ে থাকে? যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে ভিত্তি করে বর্তমানের এই রাষ্ট্রব্যবস্থা, তার দায় রয়েছে ব্যক্তিমানুষের অধিকার রক্ষা করা, তার বিরুদ্ধাচারণ করা নয়। যখন দুজন মানব-মানবী নিজেদের ভালোলাগার জায়গা থেকে প্রেম-ভালোবাসায় যুক্ত হয় তখন রাষ্ট্র তথা তার পুলিশ বাহিনী কি করে সে সব মানুষদের অপমান, নির্যাতনে মেতে ওঠে? তাহলে কি ধরে নিতে হবে কল্যাণকামী রাষ্ট্রের সঙ্গে খাপ খায় না ভালোবাসা? এই ভালোবাসা যখন সমলিঙ্গের মানুষের মধ্যে ঘটে, তখন তো কথাই নেই। রাষ্ট্র তখন আইন করে সেই সম্পর্ককে অপরাধ হিসেবে কি ভাবে চিহ্নিত করে এসবের পেছনে কোনো বাস্তবসম্মত কারণ খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়, বিশেষত আধুনিক এই বিজ্ঞানের যুগে দেশে যখন উন্নয়ন, প্রগতি ইত্যাদি গড়গড়িয়ে চলেছে যেগুলো কিনা বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে তারাই বা

□□ এদেশে খাপতন্ত্রের নিয়মনীতি না মেনে প্রেম, পরিণয়ে যুক্ত হলে সেটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে তারা গণ্য করেন। আর এর শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড। অবশ্য এই সব মৌলবাদীরা সেসবকে ‘সম্মানীয় হত্যা’ বা ‘অনার কিলিং’ হিসেবে প্রচার করেন আর এ ব্যাপারে হিন্দু, মুসলিম থেকে শুরু করে অধিকাংশ ধর্মে এই অনার কিলিং বিষয়টা এখনও চলে আসছে....

কিভাবে এই রাস্তায় হাঁটেন?

যে রাষ্ট্র ব্যাক্তিমানুষের সম্পর্ক তা সে ভালোবাসা, ঘনিষ্ঠতা, বিবাহ যাই হোক না কেন তার বিরুদ্ধে সরব হয় এবং আইন, পুলিশ-প্রসাশনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণের রাস্তায় হাঁটে তখন বুঝতে হবে এই রাষ্ট্রীয় কাঠামোর গোড়ায় গলদ রয়েছে। গলদ রাষ্ট্রীয় চিন্তাভাবনায়, কাঠামোয় তথা তার পরিচালনা পদ্ধতিতে। গণতান্ত্রিক নিয়মনীতি পদ্ধতি প্রকরণের সঙ্গে এ ধরণের কাজগুলোকে কিছুতেই মেলানো যায় না, এর ভেতরে লুকিয়ে রয়েছে স্বৈরতন্ত্রের বীজ। যে স্বেচ্ছাচারী সংস্কৃতি পুলিশ-প্রশাসনকে বুক ফুলিয়ে থানার মধ্যে নারী নির্যাতন তথা যৌন নির্যাতন করতে উৎসাহিত করে, কুড়ানকুলামে নিউক্লিয়ার চুল্লি বিরোধী জনসাধারণকে দেশদ্রোহিতার অপরাধে কারারুদ্ধ করে, সেই একই রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতি দুটো মানুষের মধ্যেকার প্রেম-ভালোবাসার সম্পর্ককে নানান কায়দায় ‘বেআইনি’ হিসেবে খাড়া করে। ঘটনাগুলো ভিন্ন মনে হলেও এসবের মধ্যে একটা সাধারণ সূত্র রয়েছে। বিভিন্ন মানুষের মধ্যে যে বিভিন্ন মতামত, ব্যবহার তথা রুচির ভিন্নতা থাকতে পারে, সেটাই স্বাভাবিক। সেই বৈচিত্র্যময় স্বাভাবিক সম্পর্ক ও সংস্কৃতি মানবজাতির বৈশিষ্ট্য।

এই সমস্ত ধরণের সম্পর্কের বৈচিত্রতাকে একটা ছাঁচে ফেলে বাকি সব কিছুকে অন্যায়, অযৌক্তিক, আখ্যা দেওয়া, বেআইনি, অপরাধী বলে চিহ্নিত করার উন্নাসিকতা ও অসিহিষ্ণুতা এক বিপদ্জনক দিক। রাষ্ট্রীয় ধ্যানধারণায় যত এই অসহিষ্ণুতা বাড়বে ততই সমাজ, দেশ ও দেশের চিত্রকল্প বদলাতে তথা ভাঙতে থাকে। মানুষে-মানুষে হিংসা, সংঘর্ষ বাড়তে বাড়তে তখন এক ভিন্ন মাত্রা পেয়ে যায়। আমরা বোধ হয় সেই ভয়ংকর দিনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এখনও হয়তো সময় রয়েছে হাতে ব্যানার নিয়ে রাজপথ ধরে মিছিল করে একসঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইতে হবে ‘ভালোবাসাকে একটা সুযোগ দেওয়া হোক’, যেমন আমরা বহুবার শান্তিকে সুযোগ দেওয়ার দাবি তুলে রাজপথে হেঁটেছি।

**স্মরজিৎ জানা**


# দু র্বা র ভা ব না

## পাওয়া যাচ্ছে

ক ল কা তা য় :

হাওড়া স্টেশন ( কলকাতা বাসস্ট্যান্ড, হাওড়া বাসস্ট্যান্ড) শিয়ালদহ স্টেশন (শানসাইন বুকস্টল, রামকৃষ্ণ পুস্তকালয়)
কলেজ স্ট্রিট (পাতিরাম, বুকমার্ক, মণীষা গ্রন্থালয়, বইচিত্র ও অন্যত্র) রাসবিহারী মোড়, শ্যামবাজার (পাঁচমাথার মোড়)
ঢাকুরিয়া (দক্ষিণাপণের বিপরীতে ব ই ক ল্প [দোতলায় ]) বিধাননগর (উল্টোডাঙা) এবং
শিয়ালদহ-কল্যাণী শাখা ও শিয়ালদহ-বারাসাত শাখার বিভিন্ন রেল স্টেশনের বুকস্টলে ও অন্যত্র।

ক ল কা তা র বা ই রে

□ পশ্চিম মেদিনীপুরে ভূ র্জ প ত্র (বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি রোড) □ শান্তিনিকেতনে সু ব র্ণ রে খা
□ কুচবিহারে পার্থ লাহিড়ী, এইচ এন রোড □ নবদ্বীপের পোড়ামাতলায় সু জ য়া প্র কা শ নী □ শিলিগুড়িতে বু ক স

যারা পত্রিকার এজেন্সি নিতে চান সরাসরি আমাদের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।
অথবা ফোন করুন ০৮৪২০ ০৬৬৫৯৪ অথবা ০৩৩ ২৫৪৩ ৭৫৬০

# লভ্-হোটেল-জাপানে যৌনবিলাসের আধুনিক অনুষঙ্গ

মিত্রা মুখোপাধ্যায়

কর্মঠ,পরিচ্ছন্ন আর শৃঙ্খলাপরায়ণ হিসেবে জাপানবাসীর সুনাম দুনিয়াজোড়া। সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনে প্রাইভেসি বা গোপনীয়তাকে এখানকার মানুষ অসম্ভব গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। ২য় বিশ্বযুদ্ধ ও শিল্পবিপ্লব জাপানের আর্থসামাজিক জীবনে বড়োসড়ো পরিবর্তন আনলেও জাপানবাসীরা ঐতিহাসিক ভাবে এতিহ্যানুসারি জাতি। বিভিন্ন সামাজিক গবেষণা থেকে পাওয়া তথ্য থেকে জানা গেছে, এখনও জাপানে ছেলেমেয়েরা বিয়ের ক্ষেত্রে অভিভাবকদের বাছাই করা পাত্র-পাত্রীর উপর নির্ভর করে থাকে। লিভ-টুগেদার এখনও পুরোপুরি সামাজিক ও আইনি স্বীকৃতি পায় নি। আর বিয়ে-বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে সন্তানধারণ নৈব-নৈব চ। সমাজ মূলত পুরুষতান্ত্রিক এবং মেয়েরা এখন উপার্জনমূলক কাজে নিয়োজিত হলেও ঘরগেরস্থালি সামলানো, বাচ্চাদের দেখভাল করা, পড়াশুনায় সাহায্য করার সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের বয়স্কদের দেখাশোনা করার দায়িত্ব পালন করাকে লক্ষ্মী জাপানি বৌ-এর ধর্ম বলে মনে করা হয়। সমাজে লিঙ্গবৈষম্য বেশ বড়ো আকারের। প্রযুক্তি, শিক্ষা, অর্থনীতিতে যতটাই আধুনিক, সামাজিক অভ্যাস ও আচরণের দিক থেকে জাপানবাসীরা ততটা আধুনিক নয়। এখনও জাপানে যে সব মেয়েরা মা হতে পারেন না সামাজিক ভাবে তাদের নানা বৈষম্যের শিকার হতে হয়। আর এটিকে জাপানি সংস্কৃতিরই অঙ্গ বলে মানা হয়। বিবাহ-বিচ্ছেদ জাপানিদের না-পসন্দ। তাই বিবাহ-বিচ্ছেদের হার এখনও জাপানে উন্নত দেশগুলোর তুলনায় উল্লেখযোগ্য ভাবে কম।

গবেষণায় পাওয়া আরও একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য হলো, পশ্চিমী দেশগুলোর তুলনায় জাপানি দম্পতিরা বিস্ময়কর ভাবে যৌনতাহীন দাম্পত্যজীবন যাপন করে থাকেন। শুধু তাই নয় পরিসংখ্যানে জানা গেছে, যৌন-সম্পর্কহীন বিবাদিত দম্পতির সংখ্যা সবচেয়ে বেশি জাপানে। আর মজার ব্যাপার হলো, পশ্চিমীরা যেখানে অসুখী, যৌনতাহীন দাম্পত্যজীবন টিকিয়ে না রেখে, পুরোনো সম্পর্ক ভেঙে নতুন কোনো সম্পর্ক স্থাপনের রাস্তায় হাঁটেন, জাপানিরা সেখানে নৈতিকতার দোহাই দিয়ে বিয়েই করে না। কিন্তু পুরুষেরা সপাটে বিয়ে বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক চালিয়ে যান— যা নিয়ে আবার বিশেষ কোনো সমস্যায় পড়তে হয় না। সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে, জাপানের প্রচলিত ধারা মেনে এই যুগেও জাপানি মহিলারা একটি বা দুটি সন্তানের মা হওয়ার পরে যৌনজীবন সম্পর্কে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। অথচ মজার ব্যাপর হলো, এই মুহূর্তে পৃথিবীতে সেক্স টয় (যৌন আনন্দের জন্য বিভিন্ন বয়সের খেলনার ব্যবহার) আর পর্নোগ্রাফির সবচাইতে বড়ো উৎপাদক দেশ হলো জাপান। সম্প্রতি কানাডার লেথব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণা থেকে জানা গেছে, গুরুত্বপূর্ণ এক তথ্য। জাপানে প্রণয়ীদের মধ্যে নিভৃত আলাপচারিতা ও অফুরান যৌন আনন্দ উপভোগের জন্য বেশ কয়েক দশক ধরে 'লভ্ হোটেল' পরিষেবার চাহিদা দিন কে দিন বেড়ে চলেছে। বস্তুত ১৯৬০-র দশক থেকেই জাপানের কিছু অভিজাত ও দামী হোটেল প্রেমিক-প্রেমিকা, হবু দম্পতি এবং সদ্য বিবাহিতদের হলিউডি ছবির আদলে রোমাঞ্চকর সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে বিলাসবহুল ব্যবস্থাপনা চালু করেছিল। এর মাধ্যমে বিবাহিত পুরুষ ও মহিলারা আনন্দ উপভোগ করার জন্য নানান পরিষেবাও পায়। গবেষকরা দেখেছেন,আধুনিক সময়েও এই লভ্-হোটেলগুলি সময়োপযোগী ধরণের পরিষেবা জোগান দেওয়ার পাশাপাশি ব্যাবসায়িক লাভের কথা মাথায় রেখে বাজার ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছে। গবেষকরা বলছেন, এই লভ্-হোটেল পরিষেবা জাপানের সংস্কৃতির প্রায় এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠছে।

জাপানবাসী ব্যক্তিগত জীবনে গোপনীয়তাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। আর এই লভ্ হোটেলগুলি তাদের গ্রাহকদের জন্য সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও আধুনিক গুনমানের বিনোদনের ব্যবস্থাপনা বজায় রাখার পাশাপাশি ব্যক্তিগত গোপনীয়তা যাতে রক্ষা পায় তার জন্যে সমস্ত রকম বিধিবন্দোবস্ত রাখে। একদিকে শৃঙ্খলাপরায়ণ ও কর্মব্যস্ত জাপানিদের দাম্পত্য জীবনে যৌন সুখের অভাব, পাশাপাশি এক শ্রেণির হাতে অঢেল পয়সা এবং আধুনিক জীবনের বিভিন্ন ধরণের চাপ ও মানসিক অবসাদ থেকে মুক্তি পেতে মনপসন্দ সঙ্গিনীকে নিয়ে লভ্ হোটেলে সুরক্ষিত পরিবেশে লাগামছাড়া সুখ উপভোগের এই বিষয়টি দিনকে দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। শুধু তাই নয় পর্যটন ব্যাবসার কেন্দ্রে থাকা জাপানি লভ্ হোটেলগুলি একদিকে যেমন উৎসাহী পর্যটক, ধনী ও বৈচিত্র্য সন্ধানীদের চাহিদা মেটাচ্ছে পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতেও মোটা অঙ্কের রাজস্ব জমা পড়ছে।

যদিও ধারণা বা আইডিয়ার দিক থেকে খুব একটা অভিনব না-হলেও লভ্ হোটেলকে ইউরোপ ও আমেরিকার রিসর্ট কালচার বিশেষত উত্তর আমেরিকায় প্রচলিত অ্যাডাল্ট মোটেল কালচারের সঙ্গে তুলনা টানা যায়, বিশেষত এই সব মোটেলে মূলত গ্রাহকরা যৌন আনন্দ উপভোগ করার জন্য রাত্রিবাস করেন। তবে মূল পার্থক্য হলো, গ্রাহকদের গোপনীয়তা সুরক্ষিত রাখার অত্যাধুনিক ব্যবস্থাপনা যা অ্যাডাল্ট মোটেল সরবারহ করে না। ২০০৭ সালের এক হিসেব থেকে জানা যায়, প্রায় তিন হাজার লভ্ হোটেল আনুমানিক ৪০০ কোটি মার্কিন ডলার ব্যবসা করেছে। হিসেব করে দেখা গেছে, প্রতি বছরে ৫ কোটি জুটি লভ্ হোটেলগুলিতে আসেন। অর্থাৎ প্রতিদিন ১০ লক্ষ-র বেশি জুটি লাভ হোটেলের পরিষেবা নেন। তবে ২০০৮ সালে জাপানে পাবলিক মরাল অ্যাক্ট চালু হলে লাভ হোটেল ব্যাবসায় কিছুটা মন্দাগতি দেখা যায়। কিন্তু হোটেলগুলি রাতারাতি ব্যাবসার আঙ্গিকে খোলনলচে বদলে ফেলে আইন বাঁচিয়ে আগের মতোই এখনও পরিষেবা জুগিয়ে চলেছে। লভ্ হোটেলগুলির আকাশছোঁয়া এই চাহিদার পিছনে সুরক্ষিত গোপনীয়তা ছাড়া অন্য আর কী কারণ থাকতে পারে তা জানতে গিয়ে দেখা গেছে, এই হোটেলগুলি গ্রাহকদের নানা বৈচিত্র্যময় যৌন আনন্দ উপভোগ করতে সাহায্য করে থাকে। গবেষকরা দেখেছেন ঐতিহাসিক ভাবে জাপানিদের যৌনতা নিয়ে কোনো ছুঁৎমার্গ বা ট্যাবু নেই। জাপানে এডো শাসনকালের সমাজব্যবস্থায় বিশেষ এক ধরণের টি-হাউস বা জাপানি ভাষায় ডে-জোয়া, অনেকটা লাভ-হোটেলের ভূমিকা পালন করত। তবে সেখানে যারা গ্রাহক হিসেবে আসতেন তারা সমাজের সাধারণ মানুষ ছিলেন না, হতেন মূলত যৌনকর্মী, ধনী ব্যবসায়ী, অভিজাত শ্রেণি ও সৈনিক। ১৯৬০-র দশকে এই লভ্ হোটেলগুলিকে ইয়োলো হোটেল, কাপল হোটেল বলা হতো। সমাজের এক বিশেষ শ্রেণির ধনীরা বিখ্যাত *রোমান হলিডে* বা *গন উইথ দ্য উইন্ড* ছবির আদলে বিশেষ ধরণের ঘূর্ণায়মান বিছানা, দেওয়াল জোড়া আয়না, স্নানঘর সম্বলিত বিলাসবহুল এই সব হোটেলে উদ্দাম প্রেম ও যৌনসুখ উপভোগের জন্য আসতেন। সত্তরের দশকে এ জাতীয় এক বিখ্যাত হোটেল ছিল টোকিওর মেগরু এম্পায়ার হোটেল।

সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে, লভ্ হোটেলগুলির এই জনপ্রিয়তার কারণ হলো ঐতিহ্যগত ভাবে জাপানে ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কৃতির মধ্যেই এরোটিকা বা যৌনতার শিকড় রয়েছে। বৌদ্ধ ধর্ম ও হিন্দু কামশাস্ত্রের প্রভাব সেই সংস্কৃতিকে আরও গভীর ভাবে প্রণোদিত করেছে। তবে জাপানের বর্ণময় যৌন-কলার অসাধারণ প্রতিভাস উদ্ভাসিত হয়েছে ১৭ শতকের শুঙ্গা অর্থাৎ বসন্তের চিত্রলিপি নামক শিল্পকলার মাধ্যমে। তুলট কাগজকে ক্যানভাস করে পাখির পালকের ডাঁটি ও সূক্ষ্ম তুলি দিয়ে প্রাকৃতিক রঙ দিয়ে শুঙ্গা শিল্পীরা অসম্ভব দক্ষতায় প্রাচীন জাপানের রভসলীলার অপূর্ব প্রতিকৃতি ফুটিয়ে তুলেছেন।

সম্রাট ও অর্থবান মানুষদের আনুকূল্যে হোকুসাই নামে এক বিশেষ শ্রেণির শিল্পীরা কাঠ ও দেয়ালে যৌনচিত্রলিপি খোদাই করে গেছেন যা আজও অমূল্য শিল্পকলার নিদর্শন হিসেবে বিশ্বে সমাদৃত। জাপানের ধর্মীয় সংস্কৃতির নাম শিন্টো। শিন্টো ধর্মীয় অনুষ্ঠানের এক উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হলো ফার্টিলিটি ফেস্টিভ্যাল যেখানে পুরুষের কৃত্রিম যৌনাঙ্গ আহুতি দেওয়া হয়।

সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে জাপানের সামাজিক জীবনে লভ্ হোটেলগুলির অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ এবং এর সামাজিক স্বীকৃতি রয়েছে। একটা সময়ে অন্তত ৫ বছর আগে পর্যন্ত জাপানে বিবাহিতদের ব্যক্তিগত জীবনযাপনের প্রধান বাধা ছিল বাসস্থানের স্থানাভাব। পরিবারতন্ত্র তখনও অটুট থাকার জন্য অনেক পরিবারেই তিন প্রজন্ম বসবাস করতেন। নব বিবাহিতরা গোপনীয়তা বজায় রাখতে ঘরের মাঝখানে পর্দা ব্যবহার করতেন। সেদিক থেকে ১৯৮০-র দশক পর্যন্ত নব দম্পতিরা বেশি মাত্রায় এই পরিষেবা নিতেন। এখন অবশ্য আধুনিক জাপানিরা আমেরিকানদের মতোই নিউক্লিয়ার পরিবারের দিকে ঝুঁকছেন। লিভ-টুগেদারের সংখ্যাও বাড়ছে। মেয়েরা আগের তুলনায় কাজের জায়গায় অংশ নিচ্ছেন অনেক বেশি মাত্রায়। বিয়ের বাইরের সম্পর্কও আর ততটা দূষণীয় নয়। এই সামাজিক পরিমণ্ডলে লভ্ হোটেলগুলি ব্যবসার ধরণ বদলে নিজেদের বুটিক হোটেল নামে বিশিষ্টতা অর্জন করতে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে। এই সামাজিক পরিমণ্ডলে লভ্ হোটেলগুলির চাহিদায় ভাঁটা পড়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বরং গ্রাহক টানতে যেসব অত্যাধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয় তাতে এই ব্যবসায় প্রতিযোগিতার বাজার তৈরি হয়েছে। গোপীয়তা রক্ষায় ১০০ শতাংশ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে গিয়ে পরিচালকরা উন্নত থেকে উন্নততর প্রযুক্তির ব্যবহার করতে পিছপা হচ্ছেন না। এজন্য আমদানি করা হয়েছে লুকোনো পার্কিং জোন, অটোমিটক লক সিস্টেম, ঝামেলাহীন বুকিং ব্যবস্থা। গ্রাহকরা ইচ্ছে করলে যে কোনো হোটেলে গিয়ে, বুকিং করার আগেই হোটেলের ব্যবস্থাপত্র দেখে নিতে পারেন। লভ্ হোটেলগুলি বানানো হয় জনবহুল ও ব্যস্ত লোকালয় থেকে দূরে। অনেক হোটেলে রেস্তোঁরার ব্যবস্থাও থাকে। হোটেল পছন্দ হওয়ার পর কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে গ্রাহক ভিতরে পা রাখা মাত্র আর বাইরে থেকে তাদের দেখা যাবে না। যারা গাড়ি নিয়ে আসবেন তাদের জন্যে লুকোনো আন্ডারগ্রাউন্ড ব্যবস্থা আছে। বেশির ভাগ লভ্ হোটেলের প্রবেশপথ থেকে করিডর, প্যাসেজ, এলিভেটর কোথাও চড়া আলার ব্যবস্থা থাকে না। এখানে প্রথাগত রিসেপশন বলেও কিছু থাকে না। কোনো কর্মীকেই কাউন্টারে দেখা যাবে না। বদলে ডিসপ্লে প্যানেলে ফাঁকা ঘরগুলির ছবি দেখানো হয়। একটি অস্বচ্ছ স্ক্রিনের পিছনে বসে কর্মীরা টাকাপয়সা ও ক্রেডিট কার্ডে লেনদেন করেন। এখন অবশ্য অনলাইনে বেশির ভাগটা হয়ে যায়। নির্দিষ্ট ঘরে ঢোকা মাত্রই অটোম্যাটিক লকিং ব্যবস্থায় দরজা বন্ধ হয়ে যায়। অনেক জায়গায় প্রেমিক প্রেমিকাদের আনন্দ উপভোগের জন্য সেক্স টয়ের ব্যবস্থা থাকে। অটোমেটিক সেক্স টয় ভেন্ডিং মেশিন থাকে, যাতে পয়সা ফেললে যৌন আনন্দ দেওয়ার খেলনা কেনা যায়। □


## দুর্বার ভাবনা

পত্রিকার এজেন্সি নিতে চান যাঁরা সরাসরি আমাদের ঠিকানায়
যোগাযোগ করুন বা ফোন করুন ০৮৪২০ ০৬৬৫৯৪
অথবা ০৩৩ ২৫৪৩ ৭৫৬০ এই নম্বরে।

# প্রেম যে কী তা....

অনামিকা সেন

**প্রেম, মানে চোখের জল—প্রেম মানে যন্ত্রণা**— বনলতা

প্রেম মানে কি, অত গুছিয়ে বলতে পারব না। তবে প্রেম মানে চোখের জল। ভালোবেসে কষ্ট না পেয়েছে এমন কেউ আছে না কি! সেই কোন্ কালে, যেদিন শেষবারের মতো শ্রীকৃষ্ণ কদমতলায় রাধারানির সঙ্গে প্রেমপিরিতি, আদর সোহাগ করে ঘুমন্ত রাধাকে ফেলে চিরদিনের মতো মথুরা ফিরে গেলেন তারপর রাধার কি হয়েছিল তা সকলেরই জানা। রাধা মরে যায় নি, বেঁচে মরে ছিল।

কার জীবনে কখন প্রেম আসবে তা কেউ বলতে পারে না। হঠাৎ একদিন মনে হয় ওকে না পেলে বাঁচব না। শয়নে-সপনে-জাগরণে কেবলই তার কথাই মনে পড়ে। আর সেই যন্ত্রণা থেকেই তো শাঁখা-সিঁদুর পরে চিরকালের মতো কাছে রাখার জন্যই স্বামী করে রাখা। যে আগে চোখে হারাত, স্বামী হয়ে সেই যখন অবহেলা করে, যন্ত্রণা দেয়— তখন নিজের ওপর রাগ হয়। তখন মনে হয় এই মানুষটাই কী সেই, যার জন্যে সব কিছু ছেড়ে পাগল হয়েছিলাম। মনের জানলায় উঁকি দেয় কয়েকটা মুখ। মনে পড়ে যায়, কোঁকড়া চুলের ফর্সা বাবুটির কথা, রোজই যে উল্টো দিকের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকত। তারপর একদিন সাহস করে সেলুনের ছেলেটাকে দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছিল। তখন আশ্বিন মাস। দুর্গাপুজোর প্যান্ডেল পড়ে গেছে। ঘরে এসে বসার পর অনেকক্ষণ কথা বলেনি। শুধুই চেয়েছিল। তারপর বলেছিল, বন্ধুদের সঙ্গে বেশ কয়েক মাস আগে নাকি আমার ঘরেই এসেছিল। সেই থেকে ভেবেছে কবে দেখা হবে। রং ব্যবসায়ী বাবুর দুচোখে তখন রঙের নেশা ধরে গেছে, তা বুঝতে ভুল হয়নি। তবে মানুষটা ছিল অন্যরকম। লেখাপড়া জানা। ভালো। সেতার বাজাতে পারত। ওর কাছে থেকেই প্রেমের বোধ কী বুঝেছিলাম। মন আর শরীর ওর সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে যেত। দু-তিন বছর নিয়ম করে আসত। কিন্তু রাতে থাকত না। ভালোবেসে সোনার কানফুল আর আলমারি দিয়েছিল। হঠাৎ করে একদিন আসা বন্ধ হলো। পরে জানলাম বাড়ির লোক জানতে পেরে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে পাল্টি ঘরে। বছর পাঁচেক পর বৌবাজারের সোনার দোকান থেকে বৌ-এর সঙ্গে বেরোতে দেখলাম। বেশ মোটা হয়েছে, কোঁকড়া চুল হালকা হয়ে চোখে চশমা উঠেছে। মুখোমুখি পড়ে, মুখ ঘুরিয়ে গাড়িতে উঠে গেল। সত্যিই কি অতগুলো দিনের প্রেম-ভালোবাসা সব মিথ্যে ছিল। কখনও কি মনে পড়ে না সেই দিনগুলোর কথা! এখনও দুর্গাপুজো এলে মন খারাপ হয়ে যায়।

**এমন একটা মানুষ খুঁজে পেলাম না যার মন আছে** — সোহাগ

প্রেম বলে সত্যিই কি কিছু আছে? মাঝে মাঝে মনে হয় সবই যেন মন ভুলোনো লোক দেখানো। যার প্রেমে ঘরবাড়ি ছেড়ে সংসার বাঁধার স্বপ্ন দেখেছিলাম। অল্পদিনের মধ্যে সেই স্বপ্ন দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠল। জীবনের লড়াই তখন থেকেই শুরু। সে লড়াই আজও থামে নি। একটু ভালোবাসা, শান্তির স্পর্শের জন্যে কাঙাল হয়ে থাকতাম। প্রথম শরীরের আনন্দ যে মানুষটার কাছে পেয়েছিলাম তাকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হলো। তখন মনে হয়েছিল এবার বাঁচব কি করে! তারপর পেশার সুবাদে অনেক লোক এল, সংসারেও থিতু হয়েছি কিন্তু সত্যিকারের ভালোবাসা ওই মানুষটাই দিয়েছিল। তবে এই এতগুলো বছরে যে কখনও কাউকে ভালো লাগেনি তা নয়। একজনকে অনেক দিন পর্যন্ত ভুলতে পারিনি। রোজ সকালে কেবল তাকে চোখের দেখা দেখব বলে অনেকটা রাস্তা পেরিয়ে চায়ের দোকানে চা কিনতে আসতাম। শুধু চোখের দেখা, একটু হাসি তার বাইরে আর কিছু নয়। কিন্তু এখনও ওর কথা ভুলতে পারিনি। জীবনের রোজকার লড়াই করতে করতে এখন আর প্রেম ভালোবাসার অনুভূতিটা আসে না। মনে হয় লড়াইটাই আমার আসে ভালো। তবে আমরা মেয়েরা যত বেশি ভালোবাসতে পারি, ভালোবেসে দুঃখ সইতে পারি, ছেলেরা তা কখনও পারবে না।

**চিরদিনের সাথী** —কৃষ্ণাডালিয়া

অনেকেই আমাকে বলে, তোমার নামটা যেন কেমন একটু অন্যরকম। সত্যি, ওরা তো ঠিক কথাই বলে। আমি কৃষ্ণাডালিয়া। আচ্ছা, বলুন তো কালো রঙের ডালিয়া চট করে কি চোখে পড়ে? না, বাবা আমি তো অন্তত দেখিনি। আসলে এটা আমার ভালোবাসার নাম। ভালোবেসে আদর করে একদিন এই নামে ডেকেছিল কেউ। আর আজ ১৪ বছর সেই নাম আমি শরীরে মনে জড়িয়ে রেখেছি। মনে হয় নামের মধ্যে দিয়েই যেন তার ছোঁয়া লাগে।

একে তোমরা প্রেম বলবে কিনা তা তোমাদের বিষয়। আমি জানি এই প্রেমই আমার জীবনের সম্বল। বেঁচে থাকার রসদ। স্বামী সুখ কাকে বলে বুঝিনি। ভরা বয়সেই একটা ছোট ছেলে নিয়ে রাস্তায় নেমেছিলাম। কত লোক দেখলাম, কত জন এল, কত জন গেল। তাদের কেউ কেউ, আজও চোখ বন্ধ করলে, স্পষ্ট ভেসে ওঠে। অনেককে ভালও লাগত। একজন, দুজন শরীর ছাড়িয়ে মনের গভীরে জায়গা করলেও পাকাপাকি কারুকেই ধরে রাখতে ইচ্ছে হয়নি। তবে সত্যিকারের প্রেম বলো, ভালোবাসা বলো, হঠাৎ যেন ঝড়ের মতো এসে একদিন সবকিছু ওলট-পালট করে দিল। সেই ঝড়ে কুটোনাড়ার মতো ভাসলাম, আজও সেই স্রোতের টানেই দু'জন ভেসে চলেছি। জানি না উজানের দিকে পৌঁছাব কিনা! সংসারে স্ত্রী-সন্তান পরিজন নিয়ে ভরা জীবনের মধ্যেও প্রতিদিন মানুষটার জীবনের এক টুকরোতে আমারও অধিকার আছে। ১৪ বছর ধরে এই নিয়মের কোনো ব্যত্যয় হয়নি। আমি যে একজন সাধারণ যৌনকর্মী নই, আমি যে বিশেষ কেউ তা ওই মানুষটি প্রথম আমাকে বুঝতে শেখায়। আমি যে কবিতা লিখি তা ওর উৎসাহেই সকলের কাছে বলতে সাহস পাই। তাই আমার সব কবিতাই আমার ভালোবাসাকে নিয়ে। ১৪ বছর হয়ে গেল আজও একদিন চোখের দেখা না হলে মন হাঁকুপাকু করে। এখনও পেয়ে হারানোর ভয় মনের কোণে উঁকিঝুকি মারে। সত্যিই তো কোনো দিন জানতে পারলে ওর পরিবার যদি ওকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যায়? আমি কী বাঁচব তখন! ওই বা কী করতে পারে? একদিন মন পরীক্ষা করতে গিয়ে বললাম, ধরো একটা ঘরে আমি আর তোমার বৌ রয়েছি। হঠাৎ আগুন লাগলে তুমি আগে কাকে বাঁচাবে! সে বলেছিল ডানহাতে বৌকে বাঁহাতে তোমাকে। মনে মনে সেদিন ভেবেছিলাম, ও তো মিথ্যে বলতেই পারত যে তোমাকেই আগে বাঁচাব। তাহলে আজও পৃথিবীতে ভালো মানুষ আছে। জীবনে এত প্রেম, ভালোবাসা আদর পেয়েছি আজ আর কোনো দুঃখ নেই। তবে কোনো দিনই শাঁখা-সিঁদুর পরে আমার ভালোবাসাকে বাঁধতে হয়নি। এখনও সে আঙুল ছোঁয়ালেই শরীরে আলতো বাজনা বাজে।

তোমরা ভালোবাসার দিন বল, প্রেমের দিন বল, আমার ছোট্ট এক কামরার এক জানালাওলা ঘরে সে রোজই আসে। তাই আমার ভালোবাসার আলাদা কোনো দিন নেই, রোজই আমার ভালোবাসার দিন। তবে তোমাদের মতো করে ভাবতে ভালোই লাগে। এবারও কাগজে পড়ছিলাম ১৪ ফেব্রুয়ারি নাকি ভালোবাসার দিন। সেদিনই সন্ধেবেলায় ও এল। ছেলে তখনও বাড়ি ফেরেনি। বলল, তোমার জন্যে জুঁইফুলের মালা এনেছি। এস খোঁপায় লাগিয়ে দিই। বললাম, দাঁড়াও শাড়িটা পাল্টে নি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হলুদ সিফনের সঙ্গে ম্যাচ করে টিপ পরলাম। ও পিছন থেকে মালাটা খোঁপায় জড়িয়ে দিল। আয়নার ভেতর কেবল আমরা দু'জন। আমি ওকে জড়িয়ে ধরলাম। ও বলল, সেই গানটা গাইবে? আমি গাইলাম— তুমি সূর্য ওঠা ভোর আমার, ওগো চিরদিনের সাথী।

**মাস্তানে হাজারোঁ হ্যায়** — নিশা

কলেজে পড়ি। ছোটো থেকেই মায়ের পেশা দেখেছি। বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝলাম এই দুনিয়ায় সহজে কেউ কারুকে কিছু দেয় না। প্রেম ভালোবাসা, রঙিন স্বপ্ন দেখানোর আড়ালে থাকে একটাই উদ্দেশ্য। আগে মা মাসিদের মুখে অনেক গল্প শুনেছি। মিথ্যে প্রেমের লোভে ভালোবাসার ফাঁদে পড়ে সারাজীবন কপাল চাপড়াতে হয়েছে কত মেয়েকে। আমি জানি মুখে যে যতই বলুক, এই এলাকার মেয়েকে বাইকের পিছনে নিয়ে, অ্যাকোয়াটিকা বা দিঘা, মন্দারমণি বা নাইট ক্লাবে যেতে যতটা সাহসী আর আসিক দিওয়ানা হোক না কেন বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দেওয়ার ক্ষমতা এদের নেই। আমি এখন একটা আলাদা ফ্লাটে থাকি। ভালোবেসে এটা একজন আমাকে দিয়েছে। পার্ট টাইম একটা কাজ করি। পয়সার জন্য অন্যের ওপর নির্ভরশীল নই। আশা করি এভাবে চললে হয়তো ওর সঙ্গেই থেকে যাব। তবে মাঝে মাঝে ভালো অফার পেলে ছাড়ি না। এখন আমি ঠিক করি কখন কার সঙ্গে ডেট করব। যাকে কথা বলে ভালো লাগে, তাকেই কাছে আসার সুযোগ দিই। কোনো কিছুই একতরফা হয় না। প্রেমের ক্ষেত্রেও সেটা সত্যি। আজকাল খুব বেশি রাখঢাক না হলেও দিওয়ানা-পরওয়ানাদের রকমসকম দেখে বুঝে যাই কে কি রকম! ভালো লাগে অনেককেই। কিন্তু প্রেমে পড়ার মতো দ্বিতীয় কারুকে খুঁজে পাই নি এখনও। যাকে ভালোবাসি তার সঙ্গেই আমার শরীর আর মনের আদানপ্রদান। চোখ বুজলে ওর মুখটা আগে দেখি। প্রতিদিন কিছুক্ষণ ও না এলে আমি খুব রেগে যাই, ঝগড়া করি। মরে যাব বলে ভয় দেখাই। তারপরে আবার খুব ভালোবাসাবাসি হয়ে সব ঠিক হয়ে যায়। আর এবছর V-ডে-তে আমাকে সোনার চেন উপহার দিয়েছে। নাচ-গান, খানা-পিনা যাকে বলে ফুল মস্তি হয়েছে। আর আমি কি দিলাম? ছোট্ট একটা নাম, 'কোকোকোলা'। এরই নাম নাম প্রেম।□


দুর্বার প্রকাশনীর সম্প্রতি প্রকাশিত দুটি উল্লেখযোগ্য বই

ONLY RIGHTS CAN STOP THE WRONG Rs 50.00

সমাজ সমস্যার সাত সতেরো **স্মরজিৎ জানা** দাম ১৯৫.০০

এ ছাড়াও

অধিকার ভাবনা সম্পাদনা : **শুভেন্দু দাশগুপ্ত** ও **স্মরজিৎ জানা** দাম : ৮০ টাকা

নারী ভাবনার বাইশ কথা সম্পাদনা : **তরুণ বসু** ও **ভারতী দে** দাম : ১০০ টাকা

পাওয়া যাবে : দুর্বার প্রকাশনী, ৪৪ বলরাম দে স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৬-এ। এ ছাড়াও কলেজ স্ট্রিটে দে বুক স্টোর, মণীষা গ্রন্থালয়। মেদিনীপুরে ভুর্জপত্র। শান্তিনিকেতনে সুবর্ণরেখা। ও অন্যত্র।

# শবর

অনিলকুমার চৌধুরী

সু-বিশাল ভারত ভূ-খণ্ডের মধ্যে ওড়িশা-চুটিয়া-নাগপুর, পশ্চিমবাংলা, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে হিন্দু সমাজের সর্বনিম্ন স্তরের একটি উপজাতি অদ্যাপি বহু আয়াসে মানভূম-পুরুলিয়ার অরণ্য সঙ্কুল দক্ষিণাঞ্চলের মানবাজার, বরাবাজার, পুঞ্চা প্রভৃতি স্থানে কোনো মতে অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে। যাদের নাম 'শবর'। জাতি তথা সম্প্রদায় হিসাবে এরা খুবই প্রাচীন। বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনতম রচনা *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ* গ্রন্থে এই শবরগণের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। 'অসুর' 'রাক্ষস'দের সমসাময়িক হিসাবে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে রচিত আদি কাব্য রামায়ণে মহর্ষি বাল্মিকী আমাদের 'শবরীর প্রতীক্ষা'র কথা শুনিয়েছেন। অতঃপর, উপরিউক্ত যুগেই মহর্ষি কৃষ্ণদৈপায়ণ ব্যাস কৃত মহাভারতেও এদের উল্লেখ সর্বজনবিদিত। শুধু তাই-ই নয়, এদের সম্পর্কে বহু কথা-কাহিনি, কিংবদন্তীও সাধারণ্যে প্রচলিত আছে। মহাভারতের যুগে এই শবরদেরই এক পূর্বসুরী 'জরাসূর' শ্রীকৃষ্ণের হন্তারক ছিলেন। সে সমূহ সংবাদ আমরা দুই পুরাণ থেকেই অবগত হয়েছি। তাছাড়া কিংবদন্তী থেকে জানা যায় যে, সুপ্রাচীন জ্যেষ্ঠ দেবতা শিবের সঙ্গে তঞ্চকতার ফলে এই উপজাতি অভিশপ্ত হয়ে বংশ পরম্পরায় অনন্তকাল ধরে এই দুরপনেয় দুর্গতির মধ্যে কাল যাপন করে চলেছে। পরম আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এরা তাদের এই দুর্গতির জন্য কারো কাছে কদাপি অভিযোগ জানায় না। প্রতিবাদ করে না, দাবি করে না, কোনো ব্যক্তিকে দায়ীও করে না। এরা ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পিত, ভাগ্যহত একটি উপজাতি। এদের কথা পরবর্তী যুগ থেকে অদ্যাপিও ধারাবাহিক ভাবে লিখিত হয়ে আসছে। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক প্লিনি-র *ইন্ডিকা* গ্রন্থে, দ্বিতীয় শতকের গ্রিক পণ্ডিত 'টলেমি'র ভাষ্যে এই শবরগণের বিশেষ উল্লেখ দেখা যায়। সহস্র বৎসর পূর্বের সহজিয়া বৌদ্ধ সাহিত্য সম্ভার 'চর্যাপদে' (দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে সংকলিত) জনৈক 'শবরপাদ' নামে এক সিদ্ধাচার্য ও 'দেবী পর্ণ শবরীর কথা বলা হয়েছে। চর্যাপদের ২৮ ও ৫০ সংখ্যক গীতি 'শবরপাদানাম্' চিহ্নিত। এই শবরপাদের প্রণীত দুইটি গীতিগ্রন্থও আছে। নাম, 'মহামুদ্রাবজ্র গীতি' ও 'চিত্ত গুহ্য গম্ভীরার্থ গীতি'। যে পর্ণ শবরীর কথা বলা হয়েছে তাঁর প্রসঙ্গেও জানা যায় যে, তিনি শবরদের মতোই ব্যাঘ্রচর্ম ও পত্র-বল্কলে ভূষিতা এবং বজ্রকুণ্ডল ধারিণী, অপস্মার দলনী। আরও একজন শবর দেবীর কথা অবশ্য জানা যায়, যাঁর নাম 'জাঙ্গলী'। ইনি সর্প ও সংগীতের দেবী, বীণাবাদিনী। বস্তুত, এই শবরগণ অনেকটাই 'বেদিয়া' সম্প্রদায়ের অনুরূপ একটি গোষ্ঠী। এরাও সাপ খেলায় এবং সর্প-দংশনের ঔষধ প্রয়োগ করে।

শ্রদ্ধেয় শশীভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁর 'হাজার বছরের পুরনো বাংলা ও বাঙালি' প্রবন্ধে *বিশ্বভারতী* পত্রিকায় লিখেছেন:

''আর্য্য জাতির যে কিছু কিছু লোকের আগমন ঘটিয়াছিল বাংলাদেশে তাহাদের ভিতরে 'কোল' জাতিই ঐতিহাসিকের চক্ষে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। আজকের দিনেও আমাদের জাতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে কোল উপাদান একটা প্রধান অংশগ্রহণ করিয়াছে। এই আদিম কোলগণের ভিতরে শবর, পুলিন্দ, ডোম, চন্ডাল প্রভৃতি এই চর্যার যুগে সমাজের একটি বৃহৎ অংশ অধিকার করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। চর্যাগুলির ভিতরে সেই জন্যই তাহারা এই প্রধান হইয়া দেখা দিয়াছে। চর্যাকারগণ নিজেরা একেবারে নিরক্ষর, অসংস্কৃত সমাজের নিম্নস্তরের লোক ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। চর্যাগুলির ভিতরে তাঁহাদের উচ্চ শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রমাণ রহিয়াছে। তাঁহাদের চোখেও বরাবর সাধনার সূক্ষ্মতত্ত্ব প্রকাশে এই শবর-পুলিন্দ-ডোম-চন্ডালের কথা, তাদের বাসস্থান, চরিত্র এবং জীবনযাত্রার কথা যখন এতো প্রধান হইয়া উঠিয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে এই সকল লোকও তৎকালীন বাঙ্গালী-জাতির একটা বড় অংশ অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় এই সকল আদিম জাতিগুলি সভ্য নাগরিক জীবন হইতে অনেক দূরে সরিয়াছিল এবং পরে ইহারাই যে সমাজের নিম্নস্তরে ভীড় করিয়াছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ ও ইহার ভিতরে পাওয়া যায়। ...শবরদের কথা ও তাহাদের বিচিত্র জীবনযাত্রার কথা এই চর্যাপদগুলিতে নানা ভাবে দেখিতে পাই। এই শবরগণ বাস করিত বড় বড় পাহাড়ের উত্তুঙ্গ শিখরে। 'বরগিরি সিহর উত্তুঙ্গ মুনি সাবরেঁ জহি কিঅবাস' (কাহ্নপাদের দোঁহা, ২৫)। ... শবর পাদের একটি গানে শবর-শবরীদের পার্বত্য জীবনের অতি চমৎকার একটি বর্ণনা পাইতেছি—

'' 'উচা উচা পাবত তহি বসই সবর বালী।
মোরঙ্গী পিচ্ছ পরহীন সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী॥
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহোরি।
নিয় ঘরিনী নামে সহজ সুন্দরী॥
নানা তরুবর মউলিলরে গঅণত লাগেলি ডালী।
একেলী সবরী এ বন হিন্ডই কর্ণকুন্ডল বজ্রাধারী॥
তিএধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসুখে সেজি ছাইলী।
সবর ভুজঙ্গ নৈরামনি দারীপেন্ধ রাতি পোহাইলী॥
হি অ তাঁবোলা মহাসুখে কাপুর খাই।
সুন নৈরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাহ॥
গুরুবাক পুঞ্জিয়া বিন্ধ নিঅমন বাণে।
একেশ্বর সন্ধানেঁ নিন্ধহ পরম নিমানে॥
উমত সবরো গুরুআ রোষে।
গিরিবর সিহর সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসে॥

উচা উচা পর্বত, সেখানে বাস করে শবরী, বালিকা, ময়ূরের পাখা পরিধানে শবরী, গলায় গুঞ্জার মালা। ওগো উন্মত্ত শবর, ওগো পাগল শবর, গোলে ভুল করিও না, দোহাই তোমার— আমি তোমারই গৃহিণী, নামে সহজ সুন্দরী। নানা তরু মুকুলিত হইল, গগনে লাগিল তার ডাল, একেলা শবরী এ বনে ঘুরিয়া

বেড়ায়— কর্ণ কুণ্ডলে বজ্রধারণ করিয়া। তিন ধাতুর খাট পাড়িল শবর, মহাসুখে বিছাইল শবর, শবর ভুজঙ্গ এবং নৈরাত্মা স্ত্রী-উভয়ে প্রেমের রাত্রি পোহায়। হৃদয় তাম্বুল, মহাসুখে কর্পূর খায়। শূন্য নৈরামণি 'নৈরাত্ম) কণ্ঠে লইয়া মহাসুখে রাত্রি পোহায়। গুরুবাক্য ধনু, নিজ মমরূপ বাণের দ্বারা বিদ্ধ, এক শরসন্ধানে পরম নির্বাণ বেঁধে। উন্মত্ত শবর গুরুরোষে, গিরিবস্ত্রের শিখর সন্ধিতে করিতেছে প্রবেশ, শবর আবার ফিরিবে কি করিয়া?

''এখানে দেখিতেছি জনবসতির দূরে উঁচু পাহাড়ে শবর শবরীর বাস, ময়ূরপুচ্ছ এবং গুঞ্জমালাই ছিল শবরীর প্রসাধন, কানে ছিল তার কুণ্ডল। ভোলানাথ শবর-শবরীকে যাইত ভুলিয়া (নেশার ঝোঁকে), শবরীকে আবার তাহাকে ডাকিয়া ঘর সামলাইতে হইত। ঘরের খাটিয়ায় পড়িত তাহাদের বিছানা, নিবিড় ছিল মিলন। তাম্বুল কর্পূর মিলনের রসপরিপোষণ করিত। শরধনু দিয়া শিকারেই হইত জীবিকা নির্বাহ। ক্রোধে পরায়ণ শবর পর্বত কন্দরে চলিয়া যাইত অনেক দূরে— একা খুঁজিত তাহাকে শবরী।

''শবরপাদের অপর একটি গানে দেখি—
'গঅনত গঅনত তইলা বাড়ি হিয়েঁ কুরাড়ী।
কণ্ঠে নৈরামণি বালি জাগন্তে উপাড়ী।।
হেরি সে মোর তইলা বাড়ী খমসে সমতুলা।
সুকড়এ সেরে কপাসু ফুটিলা।।
কঙ্গুচিনা পাকেলা রে শবর শবরী মাতেলা।
অনুদিন শবরে কিম্পিন চেবই মহাসুহেঁ ভোলা।।
চারবাসে গড়িলারে দিয়া চঞ্চালী।
তঁহি তোলি শবরো ডাহ কএলা কান্দই সগুণ শিআলি।।'

গগনে গগনে লগ্ন বাড়ী, হৃদয়ে কুঠারে তাহাকে উপাড়িয়া ফেলিলে কণ্ঠে নৈরামণি শবরী বালিকা জাগে। আমার সে গগন সংলগ্ন বাড়ি আকাশের সমতুল দেখিতেছি। কি সুন্দর তাহাতে কাপাস ফুল ফুটিয়াছে। কাগনি পাকিয়া উঠিয়াছে তাহাতে মাতিয়া উঠিয়াছে শবর-শবরী। অনুদিন শবর একটুও জাগেন না, মহাসুখে ভোলা হইয়া আছে। চারিপাশে বাঁশের কঞ্চি দিয়া (বেড়া) গড়িল, তারপরে ভুলিয়া শবর সব পুরিয়া লইল, শকুন, শিয়াল, সব কাঁন্দে।

''এখানকার সকল তত্ত্ব ব্যাখ্যা ছাড়িয়া দেখি, 'পাহাড়ের উপরে প্রায় আকাশের নীচে ছিল শবর-শবরীর বাড়ী, চারিদিকে তাহার কাপাসের ফুল। কাগনী (ধান্য বিশেষ) ছিল তাহাদের প্রিয়তম খাদ্য, কাগনী পাকিলে তাহাদের উৎসব, এই কাগনী তাহারা রক্ষা করিত বাঁশের কঞ্চির বেড়া দিয়া। পার্বত্য মাঠে ছিল শকুন শেয়ালের উৎপাত, তাহার শস্য নষ্ট করিত—ঘরে আনিয়া শস্য পুরিয়া লইলেই নিশ্চিন্ত।' "

শবরগণের প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নীহার রঞ্জন রায় মহাশয় পূর্বোক্ত পত্রিকায়—'বাঙ্গালীর আদি ধর্ম' প্রবন্ধ প্রসঙ্গে বলেছেন, ''মনসার সহিত নাম করিতে হয় জঙ্গলবাসী, শবর-কুমারী রূপিনী বৌদ্ধ 'জোঙ্গলী' দেবীর। এই দেবী বীণাবাদয়িত্রী এবং মনসার মতো তিনিও সর্পবিষ মোচয়িত্রী। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বৈদিক সরস্বতীও অন্যতম রূপে সর্পবিষ মোচয়িত্রী এবং সেক্ষেত্রে তিনি শবর কন্যা। এই গুণসাম্যের উপর নির্ভর করিয়াই পরবর্তী কালে, মনসাকে যেমন তেমনি জাঙ্গুলিকেও কোথাও কোথাও বৈদিক সরস্বতীর সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে, এবং ব্রাহ্মণ্য মনসা এবং বৌদ্ধ জাঙ্গুলী যে একই দেবী তাহাও বলা হইয়াছে। মনসা দেবীর প্রসারের প্রমাণ *কাল-বিবেক* গ্রন্থে সুস্পষ্ট।

''প্রাক্ আর্য্য-ব্রাহ্মণ্য শবরদের সঙ্গে আর একটি বজ্রযানী বৌদ্ধ দেবীর সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, ইহার নাম 'পর্ণশবরী'। ইনি ব্যাঘ্রচর্ম ও বৃক্ষ পত্র পরিহিতা, যৌবন রূপিণী, বজ্রকুণ্ডল ধারিনী, এবং পদতলে তিনি অগণিত রোগ ও মারী মাড়াইয়া চলেন। ধ্যানেই বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি ডাকিনী, পিশাচী এবং মারী সংহারিকা। সন্দেহ নাই যে, আদিতে তিনি শবরদেরই আরাধ্য দেবতা ছিলেন, পরে, কালক্রমে যখন আর্যধর্মে স্বীকৃতি লাভ করেন তখন তাহার পরিচয় হইল 'সর্ব-সবরানাম্ ভগবতী' সকল শবরের ভগবতী বা দুর্গা। বজ্রযানী বৌদ্ধ সাধনায় শবরদের যে একটা বিশেষ স্থান ছিল, চর্যাগীতির অনেকগুলি গানই তার প্রমাণ। একটি মাত্র গান উদ্ধার করিতেছি (শবরপাদ-২৮, দ্র. এই লেখার পৃ. ৮, ''উঁচা উঁচা পাবত তহি বসই সবরী বালী। .... ... ), পর্ণশবরীর ধ্যান এবং এই গানটির রূপকল্পনার মধ্যে পার্থক্য বিশেষ কিছু নাই।

''পূর্ব ভারতে শবরদের এক সুপ্রাচীন ও সুবিস্তৃত সংস্কৃতির অবশেষ আমাদের জীবন যাত্রার নানা ক্ষেত্রে সুপরিস্ফুট। পাহাড় মন্দিরের অসংখ্য মাটির ফলকে শবর নর-নারীদের দৈনন্দিন জীবনের নানা ছবি যেভাবে উৎকীর্ণ আছে, মনে হয়, জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে তাহাদের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ ছিল। বাংলার নানা স্থানে, যেমন--- উত্তরবঙ্গে, পশ্চিম-দক্ষিণবঙ্গে (মানভূম অঞ্চল?) এই শবররা কালক্রমে আমাদের হিন্দু সমাজের নিম্নতম স্তরের স্বাঙ্গীকৃত হইয়া গিয়াছে। নীলাচল ক্ষেত্রে পুরীর সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথদেবের মন্দির ও তাঁহার পূজার সঙ্গে শবরদের ধর্ম ও পূজানুষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা আজ আর অবিদিত নাই। বাংলাদেশেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ধরা পড়িবে, বিচিত্র কি? *কাল-বিবেক* গ্রন্থে ও পরবর্তী *কালিকা পুরাণে* শারদীয়া দুর্গাপূজার দশমীতিথিতে শবরোৎসব নামে এক উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ জানা যায়। এই উৎসবে লোকেরা শবরদের মতো নগ্ন অঙ্গে গাছের পাতা জড়াইয়া, সর্বাঙ্গে কাদা মাখিয়া তালে-বেতালে পূর্ণ উদ্যমে গান গাহিত, নাচিত এবং ঢাক বাজাইত। যৌন লীলার নানা গান গাওয়া, কাহিনি বলা এবং অনুরূপ অঙ্গভঙ্গি করাও এই উৎসবের অঙ্গ ছিল। এসব না করিলে নাকি দেবী-ভগবতী ক্রুদ্ধ হইতেন। বৃহদ্ধর্ম পুরাণে এ সম্বন্ধে একটু বিধিনিষেধ আছে। এই সব অনুষ্ঠানে বিশেষ আপত্তি করা হয় নাই, তবে মা ও বোনেদের সম্মুখে এবং শক্তি ধর্মে অদীক্ষিত মেয়েদের সম্মুখে পূর্বোক্তরূপ আচরণ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।"

ঊনবিংশ শতাব্দীর সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক পুরাতাত্ত্বিক মেজর জেনারেল স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম, ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের চিটিয়া-নাগপুরের কমিশনর এড্ওয়ার্ড ট্যুইট ডালটন, ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের হিউবার্ট হিউয়েট রিস্লে প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই শবর গোষ্ঠী সম্বন্ধে বহু অনুসন্ধান করে যুগে যুগে তার ধারাবিবরণী দিয়ে গেছেন। 'শবররা সর্বত্রই নিম্ন শ্রেণির অন্ত্যজ' বলে তাঁরা অভিহিত করে গেছেন।

পণ্ডিত হরিদাস দাস মহাশয়ের সংকলিত *শ্রীশ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান* গ্রন্থের ৭৭২ পৃষ্ঠায় শবর প্রসঙ্গে উল্লিখিত আছে যে, ''পম্পা নদীর তীরবর্তী মতঙ্গ মুণির শিষ্যগণের আশ্রমের নিকটে 'শ্রমণী' নামে এক শবরী বাস করিতেন। শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার গৃহে অতিথি হইলে শবরীর উচ্ছিষ্ট বহুদিনের পর্যুষিত অথচ অমৃত বিনিন্দিত স্বাদযুক্ত ফল ভোজন করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন এবং তাঁহাকে পরমাভক্তি দান করেন। শ্রীরাম লক্ষ্মণের দর্শনে চরম কৃতার্থতা লাভ করিয়া শবরী স্বধামে প্রস্থান করেন । (রামায়ণ : অরণ্য কাণ্ড : ৭৩-৭৪)।"

নৃতত্ত্বের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীঅতুলকৃষ্ণ সুর মহাশয়, 'বাঙ্গালি সভ্যতা কতো প্রাচীন' প্রবন্ধে বলেছেন, 'বাংলার আদিম অধিবাসী অস্ট্রিক ভাষাভাষি আদি অস্ট্রালদের বংশধর হচ্ছে

সাঁওতাল, লোধা, হো, জুয়াং, শবর, মুণ্ডা প্রভৃতি উপজাতি সমূহ। প্রাচীন কালে এদের সভ্যতা যে এখনকার মতো নিম্ন মানের ছিল, তা নয়। প্রাচীনকালে এই সভ্যতা এত প্রভাবশালী ছিল যে, আজকের দিনেও ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজ সে প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারে নি। দুর্গাপূজার সহিত সংশ্লিষ্ট নব-পত্রিকার পূজা, চড়ক গাজন, লক্ষ্মীপূজার ঝাঁপি, বৃক্ষপূজা, বৃষকাষ্ঠ, আনুষ্ঠানিক কর্মে কলা, হরিদ্রা, সুপারি, পান, সিন্দুর, ঘট, শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, আল্পনা, গোময় প্রভৃতির ব্যবহার অস্ট্রিক ভাষাভাষি গোষ্ঠী তথা শবর সংস্কৃতির দান। (*দৈনিক বর্তমান*, ১৫ জুন ১৯৮৬।)

ঐতিহাসিক ড. নীহাররঞ্জন রায় তাঁর *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)* গ্রন্থের ২৮৪ পৃষ্ঠায় শবর প্রসঙ্গে জানিয়েছেন —''শবরেরা বাস করিত পাহাড়ে, জঙ্গলে, ময়ূরের পাখা ছিল তাদের পরিধেয়। গলায় গুঞ্জা বিচির মালা, কর্ণে বজ্রকুণ্ডল। শবর শবরীদের গানেরও একটি বিশিষ্ট ধরণ আছে, সেই ধরণ 'শবরী বাগ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কয়েকটি চর্যাগীতি যে এই শবরী রাগে গীত হইত— সে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই চর্যাগীতির মধ্যেই আমরা বজ্রযানী বৌদ্ধ দেবতা পর্ণ-শবরীর রূপাভাস পাইতেছি --- পাহাড় পুর-এর ধ্বংসস্তূপের পোড়ামাটির ফলকগুলিতে সমাজের নিম্নস্তরের এই সব গোষ্ঠী ও কোমদের দৈহিক গঠনাকৃতি, দৈনন্দিন আহার-বিহার, বসন-ব্যসনের কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। বৃক্ষপত্রের পরিধান, গলায় গুঞ্জা বিচির মালা এবং পাতা ও ফুলের নানা অলংকার দেখিলে শবরী মেয়েদের চিনিয়া লইতে দেরি হয় না।''

আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শ থেকে বিদূরিত এই গোষ্ঠী বস্তুত তার জীবনচর্যায় আজও নতুন কোনো মৌলিক পরিবর্তন সূচিত করতে পারেনি। আজও তারা সেই পর্বত অরণ্যের আশ্রয়েই থেকে গেছে। নগর পরান্মুখ এই উপজাতিটি আজও একান্তে নিভৃতে, লোকচক্ষুর অন্তরালে জীবিত আছে। এদের মূল জীবিকা শিকার, আত্মরক্ষার প্রধান অস্ত্র কুঠার। এরা কৃষিকার্য করে, কুটির শিল্পে অগ্রণী, নানান ধরনের হস্তশিল্প এদের জীবিকার সহায়ক।

শবরগণ অন্ত্যজ, পরিত্যক্ত, নিম্নশ্রেণির প্রজাতি হওয়া সত্ত্বেও তাদের সংস্কৃতি, শিল্প-চেতনা বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধ। ভক্তিমার্গ এবং সাহিত্যকর্মে ও এই শবরগণের স্বচ্ছন্দ যাতায়াত গুণী-সমাজে পরিকীর্তিত। তাছাড়াও এরা দক্ষ পর্বতারোহী এবং শৈল ও অরণ্য অঞ্চলের কুশলী পথ প্রদর্শক। পশু পাখির চরিত্র ও চালচলন এরা শিশুকাল থেকেই আয়ত্ত্ব করে নেয়। ড. নীহাররঞ্জন রায় তাঁর *বাঙ্গালির ইতিহাস* গ্রন্থে বলেছেন যে, শবররা প্রাচীন অস্ট্রিক জাতির একটি শাখা। এরা বাস করতো গঙ্গা যমুনার অববাহিকা বরাবর কোল, মুণ্ডা, অসুর, নিষাদ প্রভৃতি উপজাতির প্রতিবেশে। এই শবররা নাকি মোট জনসংখ্যার ১.৪৩ শতাংশ। উচ্চবর্ণের মানুষ এদের 'জন্ম-অপরাধী' আখ্যা দিলেও সত্যই এরা তা নয়। বস্তুত অপরাধী হয়ে কেউ জন্মায় না। শব্দটা নিতান্তই অবৈজ্ঞানিক। অর্থনৈতিক দুরবস্থা এদের অপরাধী হতে প্রবুদ্ধ করে, আর মহাজনেরা সেই সুযোগে তাদের চিহ্নিত অপরাধীতে পরিণত করার আর্থ সামাজিক অপকৌশল প্রয়োগে তাদের চরিত্র হনন করে থাকেন। বর্তমানে কিছু সমাজ সচেতন ব্যক্তি এদের উন্নতির জন্য বহুতর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ফলোদয়ও কিছু হয়েছে। সে কারণে খানিকটা অসুবিধায় পড়েছেন মহাজনেরা। কিছু দিন হল সাবেক পুঞ্চা থানা এবং বর্তমানে কেন্দা থানার রাজনয়াগড়ে এরূপ একটি সমিতিও গড়ে উঠেছে যাঁরা শবরদের হস্তশিল্পের পশরা বিপননের ব্যবস্থা করে এবং বহুতর প্রশিক্ষণের সাহায্যে এই শবর কুটির শিল্পটিকে সচল করে রেখেছেন। ফলত নিকটবর্তী অনেক শবর পরিবারের আর্থ-সামাজিক উন্নতি সাধিত হয়েছে। শবর-খেড়িয়াদের উন্নতি বিধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারও স্থানীয় জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্রের মাধ্যমে বহুদিন আগে থেকেই এদের জন্য নানা প্রকার কুটির শিল্পের প্রকল্প দ্বারা তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় শ্রীবৃদ্ধি করে আসছিলেন। এখনও কেন্দ্রীয় সরকার ৭৫ শতাংশ এবং রাজ্য সরকার ২৫ শতাংশ অনুদান দিয়ে চলেছেন এই শিল্পটির সাহায্য কল্পে।

রিস্‌লে সাহেবের *ট্রাইব্‌স্ অ্যান্ড কাস্টস অফ বেঙ্গল* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ২৪৬ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত তালিকা থেকে জানা যায় যে ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে মানভূমে মাত্র ১৯৭ জন শবরের বাস ছিল। শতবর্ষ পরে ১৯৮১-র লোক গণনায় দেখা যায় তারা সংখ্যায় অনেক বেড়ে ৪৪৮৫-তে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান কালে মানভূম পুরুলিয়ায় এদের সংখ্যা মোট, কমবেশি ৬৯৪৮ জন (১৯৮১ আদমসুমারি)। খেড়িয়া, শবর, লোধা মূলত একই গোষ্ঠীর মানুষ। স্থান ভেদে নামের পার্থক্য হয়ে থাকে। এরা নিজেদের ঘরের প্রাচীরগুলি শিল্পীসুলভ নানা ফুল, লতা, পাতায় সৌখিনভাবে চিত্রিত করে রাখতে ভালোবাসে আরও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মতোই। কোনো কোনো দেওয়াল হাঁস, পাখি, প্রজাপতি প্রভৃতির সাহায্যে অলঙ্কৃত করে রাখে। এরা মৃতদেহ সমাধিস্থ করে কিন্তু মুখাগ্নি কৃত্যেরও বিধি আছে। সমাধিভূমির মূল্য স্বরূপ সমাধি ক্ষেত্রে ষোলো আনা ধরে দেওয়া এদের সামাজিক বিধান। অপরাপর সামাজিক ক্রিয়াকর্মে এরা প্রধানত হিন্দুদেরই রীতিনীতি অনুসরণ করে থাকে। এরা পাহাড় দেবতার পূজাও দেয়, মনসাদেবীর পূজাও করে আপন আপন গৃহের তুলসীতলায়। সেখানে তারা হাঁস বলিও দেয়। শিব, কালী প্রভৃতি দেবীগণের পূজাও এদের মধ্যে প্রচলিত আছে। কালীপূজার রাত্রি এদের কাছে মহোৎসবের রাত্রি। এই অবসরে পানোৎসবে আপ্লুত হয়ে নিশি যাপন করে থাকে শবর-শবরী। মধুক ও হাঁড়িয়ার রসাবেশে স্বর্গ সুখে অতিবাহিত করে সেই অমানিশি। ...

মানভূম পুরুলিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের নানা গ্রামেই এরা ইদানীং বসবাস করছে। কুমারি, নেংসাই, টটকো, হনুমতি, চাকা প্রভৃতি পাহাড়ি নদীগুলির অববাহিকায় এদের বাস। সাধারণত গ্রামের বহির্ভাগে একান্তে কোনো উচ্চ অনুর্বর জমিতেই মাটির কুঁড়েঘরে এরা শান্তিতে বসবাস করে। মানভূম পুরুলিয়ায় প্রতিষ্ঠিত শিল্প লাক্ষা, তসর, মুখোশ শিল্পের পাশে একটি নতুন সংযোজন শবরগণের কুটির শিল্প। খেজুরপাতা, কাশ, বাঁশ, বেত প্রভৃতি নানা সহজলভ্য প্রকৃতিজাত কাঁচা-মালের সাহায্যে সুন্দর সুন্দর সৌখিন তৈজসপত্র তৈয়ারিতে দক্ষ শবর-শবরী ইতিমধ্যেই শিল্পী সমাজে গণ্য হয়ে উঠেছে। আজ আর তারা অপহারক বা গৃহভেদী নয় ---নিতান্ত সভ্য, শান্তিপ্রিয়, পরিশ্রমী একটি উপজাতি।

**আকরগ্রন্থ**


১.E.T.Dalton, *Ethnology of Bengal*, p.149-50.

২.H.H Risley, *Tribes & Castes of Bengal*, p.241.

৩. মণীন্দ্রমোহন বসু, *চর্যাপদ*, পৃ. ১৩৪, ২২৯।

৪. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালির ইতিহাস*, পৃ. ১০৮, ১৮৬, ২৮৪।

৫. *দেশ*, ১১জানুয়ারি ১৯৮৬, পৃ. ৭৭,৮৪।

৬. মাখনলাল রায়চৌধুরী, *ইতিহাস*।

৭. উপজাতি কল্যাণ দপ্তর।

৮. *বিশ্বভারতী পত্রিকা*, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৫।



কৃতজ্ঞতা : সুভাষ রায় সম্পাদিত *পুরুলিয়ার শবর ও গোপীবল্লভ সিংদেও*, পুরুলিয়া, ২০০৫, পৃ.৪২-৯।

# কৃষি সংকট ও জিন প্রযুক্তি

দেবীন্দর শর্মা

ভারতে কৃষিসংকটের সুযোগ নিয়ে বীজের একচেটিয়া কারবার এবং বিদেশি পুঁজির বিনিয়োগ এখন ভারতে খাদ্য নিরাপত্তা এবং সার্বভৌমত্বের ওপর আঘাত হানছে। বস্তুতপক্ষে জিনশস্য হয়ে উঠছে ভারতের অন্তর্বাণিজ্য ও স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করার পরোক্ষ উপায় মাত্র। গত ৩০ অগাস্ট, ২০১২-য় একচেটিয়া আগ্রাসন বিরোধী মঞ্চ, অন্যান্য ভাতৃপ্রতিম সংগঠনের সহায়তায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক সভাগৃহে একটি বক্তৃতা সভার আয়োজন করেছিল — কৃষি সংকট ও জিন শস্য বিষয়ে। মূল বক্তা ছিলেন ভারতে আধুনিক জীববিজ্ঞান ও জিনপ্রযুক্তির অন্যতম মুখ্য স্থপতি অধ্যাপক পুষ্প মিত্র ভার্গব ও খাদ্যবাণিজ্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, সাংবাদিক (*ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*, নয়াদিল্লী) দেবীন্দর শর্মা। শ্রী শর্মার ইংরেজি অভিভাষণটির বাংলা অনুবাদ এটি। ভাষান্তর **প্রতুল মুখোপাধ্যায়**। শ্রী মুখোপাধ্যায় ও একচেটিয়া আগ্রাসন বিরোধী মঞ্চ-কে কৃতজ্ঞতা জানাই — সম্পাদক

বিশ্বায়নের সময় যখন সবার মুখেই শোনা যাচ্ছে যে ভারতের কৃষককে বিশ্বজোড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার সামনে দাঁড়াতে হবে, তখন আমি যদি আমেরিকার একটি গোরুকে ভারতের কৃষকদের সঙ্গে তুলনা করি বা সেই কৃষকের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখি, তাহলে ব্যাপারটা বেশ, যাকে বলে মানানসই হবে। আপনি যদি ইউরোপে বা আমেরিকায় একটি গোরু এক বছরের জন্য পালন করতে চান, তাহলে প্রতিটি গোরুর প্রয়োজন হবে একটি বৈদ্যুতিক পাখা এবং কেন্দ্রীয় উত্তাপব্যবস্থা [central heating condition]। আর পৃথিবীর এ প্রান্তে একজন কৃষকের বিলাস-ব্যসনের কথা তো আপনার জানাই আছে। যদি আপনি ইউরোপে একটি গোরু পালন করেন তবে একটি গোরুর খাদ্য উৎপাদনের জন্য দরকার হবে ৮-১০ হেক্টর মান ২০-২৫ একরের মতো জমি। ভারতে কৃষকদের জমির গড় মাপ হচ্ছে ১.৩ হেক্টর মতো। তাহলে সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে ইউরোপের একটি গোরুর জন্য যে পরিমাণ জমি দরকার তাতে ভারতের পাঁচ সাতটি পরিবার বেঁচেবর্তে থাকতে পারে। আপনি যদি ইউরোপে বা আমেরিকার কোনো পশুখামারে যান, তাহলে দেখবেন গোরুদের গলা ঘিরে ফালির [strap] সঙ্গে কম্পিউটার চিপ লাগানো আছে। গোরুর দুধ দোয়ানো হয় যন্ত্রের সাহায্যে। গোরুকে খাওয়ানোর সময় গোরুটির মাথা যখন একটি দেয়ালের গর্তের ভিতর গলিয়ে দেওয়া হয়, তখন দেয়ালে বসানো কম্পিউটার চিপের সঙ্গে তার গলার ফালির কম্পিউটার চিপের যোগাযোগ হয়। তারপরই বেরিয়ে আসে গোরুটির দেহের প্রকৃত ওজন, গোরুটির কত পরিমাণ প্রোটিন এবং অন্যান্য খাদ্য-উপাদান দরকার, ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ তথ্য। তার মানে ইউরোপ বা আমেরিকার গোরু হচ্ছে খাদ্যের দিক থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুরক্ষিত প্রাণী। পৃথিবীতে প্রতি রাতে একশো কুড়ি কোটি [১.২ বিলিয়ন] মানুষ ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুমোতে যায় ঠিকই, তবে বিশ্বায়িত ব্যবস্থায় একটি গোরু যাতে খুবই ভালোভাবে খেতে পায় সেই প্রয়াসের অভাব নেই। এটাই হলো পৃথিবীর বেশ খানিক জায়গা জুড়ে খাদ্য-নিরাপত্তার সার কথা। যদি বৈষম্যের কথা তোলা হয়, তাহলে কিন্তু গল্প এখানেই শেষ হবে না, যদি আপনি দেখেন একটি গোরু কত ভরতুকি পায়। তথ্যসূত্র থেকে জানা যাচ্ছে আমেরিকায় একটি গোরুর জন্য দৈনিক ভরতুকির পরিমাণ ২.৭ ডলার অর্থাৎ ১৫০ টাকার মতো। আর অর্জুন সেনগুপ্ত কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী ভারতের প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষের দিনে কুড়ি টাকার বেশি খরচ করার সাধ্য নেই। জাপানে চলে গেলে দেখবেন সেখানে ভরতুকি আরও উঁচুতে উঠে দৈনিক ৮০০ টাকায় পৌঁছেছে। যদি আপনি একটি গোরুর জন্য সব রকম ভরতুকির পরিমাণ যোগ করেন, তাহলে অবাক হয়ে দেখতে পারেন ওই টাকায় প্রতিটি গোরু বিশ্ব জুড়ে বাণিজ্য ভ্রমণ করতে পারে। বিশ্বায়িত পরিবেশে কৃষকদের বিশ্ব জুড়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। ভারতের কৃষকের চ্যালেঞ্জটা কিন্তু অন্য দেশের কৃষকদের সঙ্গে নয়, গোরুর সঙ্গে। মনে পড়ে, আমি যখন লন্ডনে এ ব্যাপারটির কথা লিখেছিলাম তখন সেটি কিভাবে গৃহীত হবে, সে বিষয়ে নিশ্চিত ছিলাম না। পরে আমি দেখলাম সারা বিশ্বের অর্থনীতিবিদ্‌দের সূক্ষ্ম সংবেদিতায় [sensibility] যেন একটা প্রচণ্ড আঘাত পড়ল। মানবিক বিকাশ প্রতিবেদন [Human Development Report] ও বিশ্ব ব্যাঙ্ক প্রতিবেদনের [World Bank Report] তুলনামূলক আলোচনা ও তথ্য আপনারা জানেন। এরপর তাঁরা ধনী দেশগুলির গোরুর ভরতুকির সঙ্গে বিকাশশীল দেশের মানুষের ভরতুকির তুলনা করতে শুরু করলেন। এবার আমার অবাক হওয়ার পালা। আমার মনে পড়ল জর্জ অরওয়েল লিখেছিলেন, ‘সব পশুই সমান, তবে কোনো কোনো পশু বেশি সমান।’ আমার মনে হলো এখন এই বাক্যটির বদলের প্রয়োজন আছে। ‘সব পশুই সমান তবে কোনো কোনো পশু মানুষের চেয়েও বেশি সমান।’

দ্বিতীয় যে ছবিটি আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি তা হবে আমরা যে, একচেটিয়া আগ্রাসনের কথা বলি তার একটি যথার্থ উদাহরণ। ২০০৪ সালটি আন্তর্জাতিক স্তরে ধুমধাম করে পালন করা হল ধান্য বর্ষ [Year of the Rice] হিসেবে। আপনারা তো এমন জায়গা থেকে এসেছেন যেখানে ধানের উৎপাদন এবং ব্যবহার দুটিই হয়। আপনারা কি মনে করতে পারেন ধানের সঙ্গে সম্পর্কিত এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা যা ২০০৪ সালে ঘটেছিল? তবে সারা বিশ্বে ২০০৪ সালে ধান্য বর্ষ পালন করা হল কেন? এর আগে আন্তর্জাতিক ধান্য গবেষণা সংস্থা [International

Rice Research Institute] যেবার বামন প্রকারান্তর [dwarf variety] বার করল, তখন এমন এক ধান্য বর্ষ উদ্‌যাপিত হয়েছিল। ২০০৪ সালে সারা বিশ্বে ধান্য বর্ষ উদযাপন করার মতো কী ঘটল? যে কারণই হোক আমাকে সুইট্‌জারল্যান্ডে ধান্য বর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত সভায় উদ্‌বোধনী ভাষণের জন্য আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। সুইট্‌জারল্যান্ড যাত্রার পথে আমি ভাবছিলাম--- যতদূর আমার জনা আছে সুইট্‌জারল্যান্ডে ধান উৎপন্ন হয় না। তাহলে সুইটজারল্যান্ডই বা ধান্য বর্ষের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রক দেশের ভূমিকা পালন করছে কেন? তাই আমার উপস্থাপনায় আমি বলেছিলাম, যে ব্যাপারটি আমার কৌতূহল জাগিয়ে তুলছে তা হলো, আমাকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে ভারত থেকে, যেটি একটি ধান উৎপাদক দেশ, ধান্য বর্ষের ব্যাপারে বক্তৃতা করবার জন্য সুইট্‌জারল্যান্ডে এসে যে দেশে ধানই উৎপন্ন হয় না। এর নিশ্চয় কোনো নিহিত কারণ আছে। সমবেত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাবৃন্দ, কারণটি বলছি। সম্মিলনটি হয়েছিল বেসেল নামে একটি জায়গায়, যেখানে রয়েছে সিনজেন্টা নামে একটি বহুজাতিক সংস্থার সদর দপ্তর। এবং সিনজেন্টা সেই বছরেই ধানের জেনোম [genome] এর ৯৮ শতাংশ পর্যন্ত মানচিত্রায়ণ [mapping] করতে পেরেছিল। তারা এটা পরিষ্কার ভাবেই ঘোষণা করেছিল এই গবেষণার ফল তারা কাউকেই আর বিনামূল্যে দেবে না— যার মানে দাঁড়াল, ধান শস্যটির নিয়ন্ত্রণ চলে এল সিনজেন্টার হাতে। এবং সেজন্যই সারা বিশ্বেই ২০০৪ এ ধান্য বর্ষ পালনের ঘটা। আমি যা দেখতে পারছিলাম ভবিষ্যতে কী ঘটতে চলেছে, সেই সভায় আমার উপস্থাপনায় আমি তাই বলেছি। ধান-এর মধ্যে আছে ৩৭,৫০০টি জিন, এর পরের পর্যায়ে কোম্পানিটি ধানের জিনের যতগুলি জিনকে কব্জা করা সম্ভব তার জন্য হামলে পড়বে। এবং তাই ঘটেছিল বেশ সাফল্যের সঙ্গেই। তিন বছর পর সিনজেন্টা ধানের ৩০০০ জিনের পাইকারি ভাবে পেটেন্টের [কৃতিত্বের] জন্য দরখাস্ত করল। ইউরোপের পেটেন্ট অফিসে সেই পেটেন্টের দরখাস্ত এখনও মীমাংসার অপেক্ষায় রয়েছে। তাহলে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট সবই চলছে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণকে ঘিরেই। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল এই— ধানের চারার ৯৭ শতাংশ জন্মায় এশিয়াতে আর তার নিয়ন্ত্রণ চলে যাবে সিনজেন্টা নামে একটি কোম্পানির হাতে। সেই বিজ্ঞাপনটির কথা ভাবুন যেখানে দেখানো হয় কাদার মধ্যে ছোটাছুটি করে খেলতে গিয়ে একটি শিশুর সারা গায়ে কাদা লেগে গেল। মা মুচকি হেসে বলেন, 'Don't worry'. সার্ফ এক্সল হ্যায় না [ চিন্তা কোরো না, সার্ফ এক্সেল আছে না?] সমস্ত কৃষি সঙ্কটের কথা তো আপনাদের জানাই আছে— শস্য আর খাদ্যের পচন ও অপচয়, আপনারা দেখছেন কৃষকদের আত্মহত্যা, আরও কত কি। আর সরকার কি বলছেন? 'হমারে পাস সার্ফ এক্সেল হ্যায়।' কয়েক বছর হয়ে গেল তারা বাণিজ্য মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করেছে আনন্দ শর্মাকে সেই বিজ্ঞাপনের সার্ফ এক্সেলকে নিয়ে আসার রাস্তা সুগম করতে। সেই সার্ফ এক্সেল হলো খুচরো ব্যবসায় বিদেশি পুঁজির বিনিয়োগ সংক্ষেপে এফডিআই রিটেইল। যেমন করেই হোক সবাই বিশ্বাস করতে শুরু করছে এফডিআই রিটেইল একবার আসুক। তাহলেই একে একে কৃষকদের আয়ের নিরাপত্তার সমস্যা, দালাল বা ফড়ের সমস্যা, খাদ্য সংরক্ষণ ও গুদামজাত করার সমস্যা— এক কথায় কৃষি সম্বন্ধীয় সব সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। সার্ফ এক্সেল তো আ গয়া। আসলে আমাদের বুঝতে হবে যারা আমাদের কাছে এফডিআই রিটেলের মহান গুণাবলীর কথা বলে চলেছে তারা আসলে আমাদের বিপথে চালিত করছে, তাদের কায়েমী স্বার্থ রক্ষা করতে। আমাদের বুঝে নেওয়া দরকার এ ক্ষেত্রে বৃহৎ শক্তিগুলি ঠিক কোথায় কাজ করে চলেছে। আপনারা জি-২০-র কথা নিশ্চয়ই শুনেছেন। এই গোষ্ঠীর অধিবেশন হয়েছিল টরেন্টোতে। আপনি যদি সেই সভার সিদ্ধান্তের খসড়া পড়েন, তাহলে দেখবেন লেখা আছে, সদস্য রাষ্ট্রদের এফডিআই রিটেইলের পথে সব বাধা দূর করতে হবে। ভারত এখন পর্যন্ত তা করে উঠতে পারেনি, তাই জি-২০-র সিদ্ধান্তের কারণেই আমাদের প্রধানমন্ত্রীর উপর চাপ দেওয়া হচ্ছে। আমরা তো ওসব পড়ে দেখিনি, আমাদের খুব করে বোঝানো হচ্ছে এটি দেশের স্বার্থের সহায়ক, এটি আমাদের অবশ্যই চাই। ঘটনা এমনই যে প্রধানমন্ত্রী বলতে গেলে এ কাজের জন্যই একজন মন্ত্রী নিয়োগ করলেন। শ্রী আনন্দ শর্মা সারা দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর মুখ্যমন্ত্রীদের বোঝাচ্ছেন এ এক আশ্চর্য রকমের ভালো জিনিস, এটি আপনাদের চাই-ই, আপনাদের রাজ্যে বিতর্কের মাধ্যমে এটির পক্ষে সিদ্ধান্ত নিন। প্রথম যুক্তি এফডিআই রিটেইল এসে গেলে কোম্পানিগুলি সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে কৃষিপণ্য কিনবে, মধ্যস্বত্বভোগী দালাল ফড়ের দল দূর হবে আর কোম্পানিগুলি বেশি দাম দিয়ে কৃষকদের কাছ থেকে জিনিস কিনবে, যুক্তির ভিত্তি হিসেবে ধরে নিলে বলতেই হবে—আহা কেমন সুন্দর! আমেরিকার উদাহরণটিই ধরা যাক। খুচরো ব্যবসায়সবচেয়ে বড়ো কোম্পানি হলো ওয়াল-মার্ট। আমেরিকাতে শতকরা এক বা তারও কম মানুষ সরাসরি কৃষির কাজে নিযুক্ত, তার মানে এই নয় যে কৃষির কাজ কিছু কম হয় সেখানে। কৃষিকার্য সেখানে চলে বিরাট বিরাট সংস্থার নিয়ন্ত্রণে। সেখানকার গবেষণার বইপত্র অধ্যয়ন করলে দেখা যায় ১৯৫০ সাল বা তার আগে একজন আমেরিকান কৃষকের বাজারে এক ডলার মূল্যের কৃষিপণ্য বিক্রি করে নীট আয় হতো ৭০ সেন্ট তারপর ওয়াল-মার্টের প্রবেশ। আমরা যদি ধরে নিই 'মাঝের মানুষ' বা দালালদের বিদায় নেওয়ার পর কৃষকদের আয় বেড়ে যায় তাহলে আমি নিশ্চিত আপনারা এক্ষেত্রেও কৃষকদের আয় বেড়ে গিয়েছিল। ২০০৫ সালে এক ডলারের কৃষিপণ্য বেচে কৃষকের নীট আয় দাঁড়িয়েছিল ৪ সেন্ট। তার মানে এই পঞ্চাশ বছরে আয়ের অনুপাত ৭০ শতাংশ থেকে কমে নেমে গেছে ৪ শতাংশে। তাহলে এখানে 'মাঝের মানুষ' বা দালাল যার কথা বলা হচ্ছে খুব, সে কোথায় এখানে? আসল ব্যাপার হলো, এই দালাল যে কে, সেটা আমাদের মধ্যে বেশির ভাগ মানুষই উপলব্ধি করে উঠতে পারে না। 'মাঝের মানুষ' [middle man] হলো এমন কেউ যে থাকে উৎপাদক আর উপভোক্তার মাঝখানে। ওয়াল মার্ট আবার উপভোক্তা হলো কখন থেকে? ওয়াল মার্ট হলো একটি মস্ত বড়ো দালাল যে খুদে খুদে দালালদের খায়। তবু দেখা যাক চাষির আয়ের এমন চরম অধঃপতন হলো কী করে? এ ব্যাপারে যে সব গবেষণামূলক কাজ হয়েছে তা থেকে দেখা যাচ্ছে আমেরিকার ছোটো দালালদের জায়গায় এসেছে নানা রকমের নতুন ধরণের দালালদের এক বাহিনী। তারা ভারতের দালালদের মতো ধুতি-কুর্তা বা আমার মতো পায়জামা-কুর্তা পরা সাধারণ লোক নয়। সেখানে দালাল বা মাঝের লোকজনদের মধ্যে আছে সার্টিফায়িং এজেন্সি (প্রত্যায়ক অভিকরণ) কোয়ালিটি কন্ট্রোলার (মান নিয়ন্ত্রক) প্রোসেসিং ম্যান (সংসাধক, প্রক্রিয়াকারক) প্যাকেজিং ম্যান (আবরক ও আধার ব্যবস্থাপক)— নানারকম নতুন

মাঝের লোকজন যারা কৃষকদের যে লাভ পাওয়ার কথা তার প্রায় সটুকুই কেড়ে নেয়।

এখন আবার ভারতের দিকে তাকানো যাক। পণ্য প্রশিক্ষণ [commodity gaining]। আমি ভাবি এরা কী চমৎকার করে কেটে কুদে এক একখানি শব্দবন্ধ তৈরি করতে পারে। এরা বলে পণ্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ঠিক ঠিক দাম পাওয়া যায়। তাই নাকি। এরা জানে কী করে আমাদের বোকা বানানো যায়। আচ্ছা এবার আমেরিকার দিকে তাকানো যাক। প্রত্যেক আমেরিকান নিশ্চয়ই কম্পিউটার প্রশিক্ষিত আর তাই সে ঠিকমতো দাম পাচ্ছে, ফলে আয়ও করছে অনেক বেশি। এইবার আপনারা আমাকে বলুন, তাই যদি হবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কৃষকদের ভরতুকি দেওয়া প্রয়োজন হয় কেন? যে পরিমাণ অর্থ ভরতুকি দেওয়া হয় তার প্রায় সবটাই কৃষকর প্রত্যক্ষ আয় বলে হিসাবপত্রে দেখানো হয় এবং এ ভরতুকি একেবারে ডব্লিউটিওর [WTO— World Trade Organisation : বিশ্ব বাণিজ্যসংস্থা] নিয়ম অনুযায়ী সুরক্ষিত। আমেরিকা কিন্তু অবিচল ভাবেই বলে আসছে যে তাদের ভরতুকির ব্যবস্থা ভালোই কাজ করছে এবং প্রকৃতপক্ষে তা বাড়ছে! আমেরিকা কেন, কোনো দেশেরই কৃষকদের সহায়তা করতে চাইবার কথা নয়। আমেরিকার শাসকদের তো জ্ঞানের কমতি নেই। ২০০৮ সালেই এ পর্যন্ত শেষবার আমেরিকার সরকার কৃষি বিল [Farm Bill] পেশ করেছিল, সেখানে কৃষি সহায়তার জন্য ৩০৭ বিলিয়ন [ ৩০৭০০ কোটি] ডলার পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল। সেখানে তো ওয়াল-মার্টের মতো এত বড়ো খুচরো বিপণনের কেন্দ্র আছে আর পণ্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও আছে। অতএব এটাই দেখা যাচ্ছে ভারতে যে ধরণের কৃষি-মডেল নিয়ে আসতে চাওয়া হচ্ছে সে মডেল আমেরিকাতেই ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু যে ভাবেই হোক, আমাদের ঝোঁক হচ্ছে এটাই প্রমাণ করার যে সে মডেল ভারতে নিয়ে আসা খুব জরুরি।

আমরা আর একটা যুক্তি দেখাই— কৃষিদ্রব্যের মোড়কজাত করার বিষয়ে সংযোগ ব্যবস্থার [packaging linkage] দায়দায়িত্ব থাকবে কোম্পানিগুলিরই। বাস্তব প্রয়োগ নির্ভর [empirical] গবেষণায় পরিষ্কার ভাবে দেখা গেছে এর জন্য কোম্পানিগুলি ল্যাটিন আমেরিকা, আমেরিকা ও এশিয়ায় যে রকম দাম হাঁকে তা খোলা বাজারের দামের থেকে ২০-৩০ শতাংশ বেশি। কিন্তু আমাদের ঝোঁকটাই হলো একথা বিশ্বাস করার দিকে যে, এ সব সমস্যা ভারতে এলে তার সমাধানের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

আমাদের সবার জানা দরকার গত দু'বছরের মধ্যে ওয়াল-মার্ট কোনো এক জায়গায় নানা মন্তব্যের মধ্যে বলেছে ভারতে ওয়াল-মার্টের প্রবেশের ব্যবস্থার জন্য ক্ষমতাশীলদের নানা ভাবে প্রভাবিত [lobbing] করতে তাদের ৫০ কোটি ভারতীয় টাকার মতো খরচ হয়ে গেছে। এ তো হলো একটি কোম্পানি দু'বছরে যা করেছে সেই কথা। এরকম অন্য অনেক কোম্পানি-ই আছে। মজার কথাই বটে, আমরা বিশাল খুচরো পণ্যের দোকানের কথা ভাবলেই কেমন মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ি। কয়েক মাস আগে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি টুইট করলেন— আমেরিকানরা তাদের দেশের প্রতি এক মহান্ সেবার নিদর্শন রাখতে পারেন যদি তাঁরা রাস্তার মোড়ের স্থানীয় ছোটো দোকান থেকে জিনিস কেনেন। আর ভারতের প্রধানমন্ত্রী আমাদের অনুরোধ করছেন বিশাল খুচরো দোকান থেকে জিনিস কিনতে। কারণ হলো এই— আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জানেন আমেরিকার পক্ষে কী ভালো আর আমাদের প্রধানমন্ত্রীও জানেন আমেরিকার পক্ষে কী ভালো। আর যে ভাবেই হোক, আমাদের ঝোঁকও এটাই বিশ্বাস করার দিকে যে যা আমাদের দেওয়া হচ্ছে তা আমাদের মঙ্গলের জন্যই।

কেন? কারণ আমাদের বিশ্বাস যে এতে জিডিপি [GDP=Gross Domestic Product, মোট জাতীয় উৎপাদন] বাড়ে। যে কৃষিসঙ্কট আমরা দেখতে পাচ্ছি তার সারাৎসার আসলে জড়িয়ে আছে এই জিডিপি ব্যাপারটির সঙ্গে। আমি তো প্রায়, রোজ সকালোই খবরের কাগজ খুললেই দেখতে পাই, কেউ বলছেন জিডিপি বড়ো জের সারা বছরে ৮ থেকে ৯ শতাংশ বাড়বে। আর একজন বললেন, আরে না না, বৃদ্ধি ১৪ শতাংশের মতো হবে— এইরকম আর কি। যারা জিডিপি বিষয়ে উৎসুক, তাদের ইরাক গিয়ে আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধের পর ইরাকের জিডিপি ঊর্ধ্বে উঠবে। আসলে জিডিপি কী? এ বিষয়ে চর্চা করেন এমন যে কোনো মানুষকে যখনই প্রশ্ন করি উত্তর পাই— Gross Domestic Product মানে মোট জাতীয় উৎপাদন। কিন্তু আমাকে যদি কেউ বুঝিয়ে বলতে বলেন জিডিপি কী, আমি বলব জিডিপি হচ্ছে যে পরিমাণ টাকার হাত বদল হচ্ছে সেই পরিমাণ। তার ফলে কি হয়, যদি একটি গাছ ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে, জিডিপি বাড়ে না। কিন্তু যদি গাছটা কেটে ফেলেন, তাহলে জিডিপি বাড়ে। আপনাকে যা করতে হবে, তা হলো এই ভারতে যে কটা গাছ আছে সব কটাকে কেটে ফেলা, তাহলেই জিডিপির বৃদ্ধি হবে ২৭ শতাংশের মতো। এখন ঠিক করতে হবে জিডিপির বৃদ্ধি চাই কি চাই না। গাড়ির কথাই ধরুন, এর মধ্যেই ভারতের জনসংখ্যার ৪.৭০ শতাংশের গাড়ি আছে। তাহলে যখনই একটি গাড়ি কেনা হলো, পাওনা টাকা মিটিয়ে দেওয়া হলো, বিক্রেতা টাকা পেয়ে গেলেন, জিডিপি বেড়ে গেল। আমার মনে হয় জিডিপি বাড়ে তিনবার। প্রথমে তো আপনি গাড়ি কিনলেন, জিডিপি বেড়ে গেল। তারপর আপনি গাড়ি চালালেন, জিডিপি বেড়ে গেল। যতবার লাল আলোর জন্য গাড়ি থেমে যাবে, জিডিপি তত বাড়বে। আপনার গাড়ি থেকে বিষাক্ত গ্যাস বেরুতে থাকবে পাইপ দিয়ে, তাতে আমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হয়ে ডাক্তার দেখাতে গেল। ফি দেওয়া হল, ডাক্তার নিলেন আর জিডিপি বেড়ে গেল। জিডিপি-র বৃদ্ধির কী চমৎকার রাস্তা। হুগলি নদী যদি পরিষ্কার থাকে, তাহলে জিডিপি বাড়ে না। নদীটিকে নোংরা করা দরকার। নদীর চারপাশে শিল্প গড়ে তুলুন। সেখান থেকে যত বর্জ্য পদার্থ নদীতে পড়তে থাকবে আর জিডিপিও বাড়তে থাকবে। তখন নদীকে দূষণমুক্ত করতে আপনি একটা ১০০০ কোটি টাকর প্রকল্প নিয়ে আসবেন, জিডিপি আবার বাড়বে। তারপর আপনি আমি সেই জল খাব, অসুস্থ হব, ডাক্তারের কাছে যাব, আবার জিডিপি বাড়বে। আহা, কেমন সুন্দর উন্নয়নের মডেল বলুন তো। কিন্তু কী করে জানি না, আমাদের বিশ্বাস করানো হয়েছে যে জিডিপি যত বাড়ে, ততই আমাদের দারিদ্র্য, ক্ষুধা ইত্যাদি যত সমস্যা আছে সেগুলির ঠিকঠাক মোকাবিলা হয়। কিন্তু তাই কি হয়েছে? তাকিয়ে দেখুন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে। সে দেশের অর্থনীতি সবচেয়ে সমৃদ্ধ। তাহলে তো সেখান থেকে দারিদ্র্যের অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কথা। আপনি শুনে বিস্মিত হবেন যে আমেরিকায় এখন চার কোটি লোক ক্ষুধার্ত হয়ে কোনোমতে বেঁচে আছে, এটি গত আটাশ বছরের একটি রেকর্ড। কানাডায় যান, দশটি পরিবারের মধ্যে আটটির ক্ষুধার্ত জীবন। তাহলে যে সঙ্কটের কথা আমরা বলে চলেছি সেটা আসলে কোথায়?

আমার এসব বলার উদ্দেশ্য, আমরা বেশির ভাগ সময়ই উপেক্ষা করি, এমন বিভিন্ন যোগসূত্রের [linkage] দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট উৎপাদনেই সমস্যার সমাধান নিহিত, এই আমাদের বিশ্বাস। তার সঙ্গে তো জিডিপির যোগ। তাই আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ থাকা উচিত আরও বেশি করে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক আর, সঙ্কর বীজের উপর; কারণ এই বস্তুগুলোর মাধ্যমেই তো বেশির ভাগ সময় জিডিপির বৃদ্ধি হয়। যখনই জিডিপির কথা ওঠে, আপনি শোনেন এবার কৃষিতে বৃদ্ধি হয়েছে ৪ শতাংশ, ধরে নিন ভবিষ্যতে কৃষির ৬ শতাংশ বৃদ্ধি হলো, তাহলেই কি সঙ্কট কেটে যাবে? কৃষকেরা আর আত্মহত্যা করবে না? অথবা কৃষকের আত্মহত্যা কি কখনও এই জিডিপি মডেলকে কোনো ভাবে প্রভাবিত করে? না। কৃষিতে আসল গলদটা কোথায়, সেটা বুঝে নেবার জন্য আসুন কৃষিকে একটু খুঁটিয়ে দেখা যাক। তা করার সবচেয়ে ভাল উপায় হলো দুটি সবচেয়ে বড়ো গণতন্ত্র— আমেরিকা আর ভারতের তুলনামূলক আলোচনা।

বাংলায় দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে ১৯৪৭ সালে আমরা যখন স্বাধীনতা পেলাম, তখন ভারতে গড় জমির (land holding — পাট্টা বা ইজারা নেওয়া জমি) পরিমাণ ছিল ৪ হেক্টারের মতো। আমেরিকায় তখন গড় জমির পরিমাণ ছিল ৫০ হেক্টারের মতো। আমেরিকাতে কৃষির সঙ্গে যুক্ত লোকের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার দশ শতাংশ, ভারতে তা ছিল ৮০ শতাংশ। পরে ৬০-৬৫ বছরে পরিবার পিছু গড় জমির পরিমাণ কমে দাঁড়িয়েছে ১.৩২ হেক্টারে, কৃষির সঙ্গে যুক্ত মানুষের অনুপাত হয়েছে ৫৭ শতাংশের মতো। সংখ্যার বিচারে অবশ্য কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষ আগের চেয়ে অনেক বেশি। অন্যদিকে আমেরিকায় কৃষিসংশ্লিষ্ট মানুষের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার দশ শতাংশ থেকে কমে এক শতাংশেরও নীচে নেমে এসেছে, গুনলে সঠিক সংখ্যাটি হবে ৭ লক্ষ। কিন্তু গড় জমির পরিমাণ ৫০ থেকে বেড়ে হয়েছে ২০০ হেক্টার। তাই আমেরিকা যখন কৃষির কথা বলে, তখন সে যন্ত্রের কথা বলে, কিন্তু ভারত যখন কৃষির কথা বলে, তখন সে বলে ক্ষুদ্র কৃষকের কথা। এই হলো সেই তফাৎ যেটা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। যদি জীব বৈচিত্র্যের কথা বলি, দেশের উদ্ভূত বিভিন্ন উদ্ভিদের বীজের সংখ্যায় আমরা অনেক এগিয়ে। আমেরিকাতে নিজস্ব উদ্ভিদের সংখ্যা কত? শুনলে অবাক হবেন সে দেশে মাত্র ৫টি প্রজাতির উদ্ভিদ আর তিনটি প্রজাতির প্রাণীর উপর মালিকানার দাবি করতে পারে। আমেরিকার মাটিতে উদ্ভূত বলতে এই সব। সবার মধ্যে প্রধান উদ্ভিদ প্রজাতি হলো সূর্যমুখী আর প্রাণী প্রজাতি হলো শুয়োর। অন্যদিকে ৫০০০ উদ্ভিদ প্রজাতির জন্মভূমি এই ভারত। এখন সবচেয়ে বেশি উদ্ভিদ প্রজাতি কিন্তু আমেরিকায়। আমেরিকা এগুলি সংগ্রহ করেছে সমস্ত পৃথিবী থেকে। আমেরিকার ফর্ট নক্সে ৭০,০০,০০ প্রজাতির উদ্ভিদ মজুত আছে— রিও চুক্তি অনুযায়ী এগুলির উপর কোনো দেশের নিয়ন্ত্রণ নেই। তারা তবে এগুলি সংগ্রহ করছে কেন। এসে যাচ্ছে সেই নিয়ন্ত্রণের কথাই। তাই একচেটিয়া আগ্রসন বিষয়টি নিয়ে এখনই দুশ্চিন্তা করার যথেষ্ট কারণ আছে— এ বিষয়ে আমার নিজের কোনো সংশয় নেই।

এবার খাদ্যের কথায় আসি। ১৯৬৬ সাল যে সবুজ বিপ্লবের শুরু, তার উদ্‌বোধনে আমেরিকা সত্যিই ভারতকে সাহায্য করেছিল। আমি একবার অধ্যাপক স্বামীনাথনকে প্রশ্ন করেছিলাম ভারতের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃষিমন্ত্রী কে? আমাদের বিস্মিত করে তিনি জগজীবন রামের নাম করলেন। তাঁর নাম করার কারণ জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন— যখন জগজীবন রাম কৃষিমন্ত্রী ছিলেন, তখন তিনি রোমে অনুষ্ঠিত খাদ্য কৃষি সংস্থা [Food and Agriculture Organisation বা FAO]-র একটি সভায় গিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে। কূটনৈতিক নিয়ম অনুসারে ডিজির [Director General : প্রধান নির্দেশক] সঙ্গে দেখা করতে হলে আগে তার পরের স্থান-অধিকারী দ্বিতীয় প্রধান কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করতে হয়। এফএও-র দ্বিতীয় প্রধান কর্মকর্তা সব সময়ই হন আমেরিকান। তাঁরা দুজনে তো সেই দ্বিতীয় প্রধানের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তিনিও তাঁদের স্বাগত জানালেন। কয়েক মিনিট পরেই তিনি বললেন, 'তাহলে, আপনারা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে গেলেন। তার মানে আপনারা আমেরিকা থেকে খাদ্য আমদানি বন্ধ করে দিয়েছেন।' জগজীবন রাম বললেন, 'মহাশয়, আমরা আমেরিকার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ। আমাদের দেশকে ক্ষুধার সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করার জন্য, আর আমাদের দেশে সবুজ বিপ্লবকে নিয়ে আসার জন্য!' কিন্তু তারপর সেই মন্ত্রী বলে উঠলেন, 'এখন আমাদের দেখতে হবে আবার যাতে আপনারা আমাদের দেশ থেকে খাদ্য আমদানি করেন।' জগজীবন রামের হাতে কয়েকটা ফাইল ছিল। তিনি সেগুলো ভদ্রলোকের মুখের উপর ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, 'রাখুন তো আপনাদের কথা আর আপনাদের ওই খাদ্য রপ্তানির কথা। ভারত কোনোদিন আমেরিকা থেকে খাদ্য আমদানি করবে না আমদানি করবে না।' আমার মনে হয় কোনো ভারতীয় মন্ত্রীর পক্ষে এমন কথা বলা সত্যিই এক অসাধারণ ব্যাপার। এখন দেখা যাচ্ছে, ভারতকে আবার যে সেই খাদ্য আমদানি-কারক দেশের অবস্থায় ফিরে যেতে বাধ্য করা হবে, এমন সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এটাই হলো ভারতের এখনকার কৃষি সঙ্কটের কারণ। সবুজ বিপ্লব ঘটে যাওয়ার পর ওদের মনে হয়েছিল সমস্ত সার বেচে দেওয়াটাই ভুল হয়েছিল। তাই আশির দশকে সেনেকা বাম্পার নামে এক ভদ্রলোকের উদ্ভাবিত বাম্পার ব্যবস্থা চালু হল। আইনের এই সংশোধনী পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিল আমেরিকা এমন কোনো শস্যের জোগান দেবে না অথবা এমন কোনো গবেষণায় সাহায্য করবে না, যার ফলে অন্য দেশের ফসল আমেরিকায় উৎপন্ন ফসলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এটাই হবার কথা। আন্তর্জাতিক নানা প্রতিষ্ঠান প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠল। এর ফলে বাম্পার সংশোধনী কখনও ভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়নি। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগান বলেছিলেন যদি মার্কিন অর্থনীতি তার উৎপন্ন জিনিস বিক্রি করার কোনো জায়গা না পায়, তবে বাজার অর্থনীতিই ব্যর্থ হবে। এখন ইউরোপের খাদ্যের প্রয়োজন নেই। তবে তারা কোথায় রপ্তানি করবে? কেন? বিকাশশীল দেশগুলিতে। সেজন্য তারা ডব্লিউটিও নামে একটি প্রতিষ্ঠান খাড়া করে ফেলল। গত ত্রিশ বছরে মোট ১৫০টি দেশকে তৃতীয় বিশ্বের দেশ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ১৯৯৫ সালে ডব্লিউটিও চালু হওয়ার পর থেকে ১১০টি দেশ এর মধ্যেই খাদ্য আমদানিকারী দেশে পরিণত হয়েছে। এই ভাবে চললে বাকি দেশগুলিরও খাদ্য আমদানি করতে দেরি হবে না। দেখা যাচ্ছে উত্তর আর দক্ষিণের মধ্যে এমন ধূর্ততার সঙ্গে কাজ ভাগ করা হয়েছে যাতে এক অংশ দাঁড়িয়ে থাকবে খাদ্য নিয়ে আর পৃথিবীর বাকি অংশ দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করবে। তাহলে নীতিগুলো হলো এরকম, এই নীতি অনুযায়ী কাজ করতে গেলে একটা জুৎসই নতুন কাঠামো দরকার। তাই ভারতে যা হচ্ছে তা হলো এই— যে সব কাঠামো আমাদের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে সহায়তা করছিল সেগুলো আমরা একে একে ভেঙেচুরে ফেলছি। এখন ভারতে যে নীতি অনুসরণ কর হচ্ছে তার সঙ্গে বাংলায় দুর্ভিক্ষের সময়কার

নীতির সঙ্গে কোনো মৌলিক তফাৎ নেই। কৃষকদের মদত দেওয়ার জন্য কৃষিপণ্যের ন্যূনতম দাম ঠিক করে দেওয়ার নীতি আমরা সরিয়ে ফেলছি। খুচরো পণ্যে বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের (এফডিআই রিটেইল) পথ আমরা বন্ধ করছি না। আর আমরা সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে পণ্য কিনছিও না। তাই খাদ্য নিরাপত্তা চলে যাচ্ছে বেসরকারি ব্যবসায়ীর হাতে। ১৯৩০ সালের আগে আমেরিকা সাড়ে তিন কোটিরও বেশি লোককে কৃষি কাজ থেকে অকৃষি কাজকর্মের দিকে সরিয়ে দিয়েছিল। প্রায় একশো বছর পর ভারতেও ঠিক সেই একই কাজই করা হচ্ছে। এক কথায় যা চলছে তা হলো অবস্থানান্তর (translocation)। ১৯৯৬ সালের বিশ্ব ব্যাংকের (World Bank) বিকাশ সংক্রান্ত প্রতিবেদনে (Development Report) বলা হয়েছে কুড়ি বছরের মধ্যে অর্থাৎ কিনা ২০১৫-র মধ্যে ভারতে যে সংখ্যক লোক গ্রামীণ অঞ্চল ছেড়ে শহর-অঞ্চলে যাবে সেই সংখ্যা হবে যুক্তরাজ্য [United Kingdom], ফ্রান্স ও জার্মানির জনসংখ্যার দুগুণ। সে দিন খুব দূরে নেই। জায়গা বদল করবে প্রায় চল্লিশ কোটি লোক— আমেরিকার জনসংখ্যার চেয়েও বেশি। Draft বা সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করার কথা আমরা জানি। এখন যা চলছে তা হলো land draft এক জমি থেকে অন্য জমিতে যেতে বাধ্য করা। এই নীতিই মেনে চলা হয়েছে আমেরিকায় আর আমরা চেষ্টা করছি সেই নীতিই ভারতে নিয়ে আসতে। আমরা নিয়ে আসছি পণ্য প্রশিক্ষণ, এফডিআই রিটেইল, জিএম শস্য ইত্যাদি। এত কাণ্ড ঘটছে যখন, আমাদের এখন কী করা উচিত? চারশ কোটি মানুষ যাচ্ছে গ্রাম থেকে শহরে, এতে আমরা কী খুব সুখী হব জিডিপি বাড়ছে বলে? না কি জিডিপির থেকে আরও ভয়ানক কিছুর জন্যে আতঙ্কিত হব? আজ দেশের সমস্যার সারাৎসার রয়েছে এই কৃষি সঙ্কটের মধ্যে। আর এই দেশের ট্র্যাজিডির উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে—এই ব্যাপারটির মধ্যে—এখানে যে উৎপাদক সেই উপভোক্তা। আমেরিকায় কিন্তু ছবিটা এরকম নয়। তাহলে আমাদের কী করতে হবে?

আমাদের দরকার কৃষির ক্ষেত্রে এমন ধরণের বিকাশের ছাঁদ নিয়ে আসা যাতে কৃষি শুধু স্বয়ম্ভর ও লাভজনক হবে না, অর্থনীতিক দিক থেকেও প্রয়োগসাধ্য হবে। আমাদের সব সময় পশ্চিমকে অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তা কি করা যায়? গত কুড়ি বছরে বিভিন্ন বিকাশ সংক্রান্ত সমীক্ষায় দেখা গেছে দুধ, গম, চাল, টমাটো ইত্যাদির উৎপাদনের পরে দাম সারা বিশ্ব জুড়ে মোটামুটি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল। এমন কি মুদ্রাস্ফীতির পরও একই টাকা দিয়ে কুড়ি বছর আগে যে পরিমাণ গম পাওয়া যেত প্রায় ততটাই পাওয়া যায়। উৎপাদন করার জন্য যা যা জোগান দিতে হয় প্রাকৃতিক কারণে সেগুলির দামের সঙ্গে অনেক অতিরিক্ত খরচ যোগ হয়েছে। একজন কৃষকের যেটুকু লাভ হওয়ার কথা তা ওই বাড়তি খরচই ক্রমশ ক্ষইয়ে নষ্ট করে দিয়েছে— শেষ পর্যন্ত যার ফল কৃষকের আত্মহত্যা। চল্লিশ শতাংশ কৃষক কোনো উপায় থাকলে চাষবাস ছেড়েই দিতে চায়। আমরা জানি ভারতে কৃষকদের আত্মহত্যার হার বেড়ে চলেছে। তার কারণ নিশ্চয়ই এই নয় যে, কৃষকরা চাষ করতে জানে,না,যা আমরা শুনে থাকি। তারা প্রযুক্তির উপযুক্ত ব্যবহার জানে না, এটি মোটেই কারণ নয়, বরং বলা যেতে পারে এই প্রযুক্তিই তাদের মৃত্যুর জন্য দায়ী। এই প্রযুক্তি আমাদের মধ্যে কত ক্ষতিকর প্রভাব রেখে গেছে তা নিয়ে আমার কথা বলা ফুরোত না। কিন্তু একই সঙ্গে আমি বলছি, আমি প্রযুক্তির বিরোধী মোটেই নই। প্রযুক্তি হলো প্রযুক্তি তা সে মনসান্টোরই হোক বা প্রাচীন পঞ্চকাব্যেরই হোক। ঐতিহ্যবাহিত যে প্রযুক্তি কৃষকেরা ব্যবহার করে আসছে সেই পঞ্চকাব্য নিশ্চয়ই একটি প্রযুক্তি। কিন্তু তা মনসান্টোর মতো মার্কা বা ছাপ দিয়ে হাতে আসে না। আমাদের এটা জেনে রাখা উচিত। প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য হলো কৃষিকে আর্থনীতিক দৃষ্টি কোণ থেকে প্রয়োগসাধ্য (viable) করা। আমরা কী করব? যদি আমরা বলি এফডিআই রিটেইল সব করে দেবে— কৃষকদের উৎসাহ জোগাবার মতো দামের ব্যবস্থা করবে, তবে আমরা শুধু কৃষকদেরই বোকা বানাব না, বোকা বানাব নিজেদেরও। আমেরিকাতে ঠিক ঠিক কী ঘটেছে সেটা আমাদের জানা দরকার। আমেরিকাতে মডেল বা ধাঁচটিই আলাদা। সেখানে মাইলের পর মাইল জুড়ে কৃষিজমি, কিন্তু সে অনুপাতে কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা খুবই কম। ভারতে তো ব্যাপারটা সে ভাবে ঘটে না, বরং ঘটে এর ঠিক বিপরীত ভাবে। কিন্তু সেই আমেরিকাতেও কাঠামোও কিন্তু আর্থনীতিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রয়োগসাধ্য হয় না। ঠিক এই কারণেই তারা কৃষকদের ভরতুকি দেয়। ইউরোপে কৃষকদের আয় বাড়ানোর জন্য প্রত্যক্ষ ভাবে সহায়তা করা হয়। হল্যান্ডে একজন কৃষকের গড় আয় অন্য পরিবারের লোকের তুলনায় ২.৬৫ গুণ। তারা চাষবাসে বিশেষ কুশলতা দেখিয়েছে বলে নয়, তাঁরা তা পায় প্রত্যক্ষ ভাবে আয়ের অবলম্বন এত নেমে গেছে যে, তৎসংক্রান্ত সামাজিক আশঙ্কা হিসেবে। এখানে একটি পরামর্শ আছে— আমরা কৃষকদের আয় বাড়াবার জন্য প্রত্যক্ষ ভাবে সহায়তা [direct income support] দিতে পারি। উদাহরণস্বরূপ আমি মনে করি বাংলার এক কৃষক পরিবারের গড় মাসিক আয় ২০০০ টাকার কমই হবে। আমি তো একজন চাপরাশির ১৫,০০০ টাকা মাইনে হবার তেমন কোনো কারণ দেখি না। আমরা কেন একজন কৃষককে একজন চাপরাশির সমান করে দিতে পারি না? আমি বলছি না তাদের পুরোপুরি একরকম হওয়া উচিত। আমরা কেন কৃষকদের মাসিক আয়ের স্তরকে ১৫০০০ টাকা পর্যন্ত তুলতে পারি না? আমি তো নিশ্চিত যদি আয়ের স্তর মাসে ১৫০০০ টাকা পর্যন্ত তোলা যায়, তাহলো জায়গা বদলের ব্যাপারটা উল্টে যাবে, বেশি বেশি করে মানুষ আসবে কৃষিকাজ করতে। এই দেশের মুখ্য লক্ষ্য হওয়া উচিত কৃষিক্ষেত্রে বৃদ্ধি নয়— সে ৪ শতাংশ বা ৬ শতাংশ যাই হোক না কেন, জিডিপি নিয়ে উদ্বিগ্ন হবার কোনো প্রয়োজন নেই। যা প্রয়োজন তা হলো মাসে একটি পূর্বনির্দিষ্ট আয়। দ্বিতীয়ত, আমাদের এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে— আমরা যেন আর সবুজ বিপ্লবের ফাঁদে পা না দিই। পূর্ব ভারতে সবুজ বিপ্লবকে যেন আর ঢুকতে দেওয়া না হয়। পাঞ্জাব ও হরিয়ানার আমরা এর কুফল এর মধ্যেই দেখে নিয়েছি। পাঞ্জাবে ভূগর্ভের জলস্তর এত নেমে গেছে যে, আমাদের আশঙ্কা দশ বছর পরে পাঞ্জাবে ভূ-গর্ভস্থ জল আদৌ থাকবে না। নাসা (মার্কিন জাতীয় গবেষণা সংস্থা এবং অন্য প্রতিষ্ঠানের গবেষণায় পাঞ্জাবে ভূগর্ভে জলের ব্যবহার কী ভয়াবহ রূপ নিয়েছে সে কথা বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের অন্ধ্র প্রদেশে পরীক্ষিত কৃষি মডেলের কাছে পৌঁছোনো উচিত। এ সভায় আগেই বলা হয়েছে যে সেখানে ৩৫ লক্ষ একর জমিতে কৃষিকার্যে কোনো রাসায়নিক কীটনাশক বা কৃত্রিম সারের ব্যবহার হয়নি। সেখানে উৎপাদন বেড়েছে, পরিবেশের এবং মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে। বাংলার উচিত এমন একটি মডেল আত্মস্থ করা। কৃষি মন্ত্রক অবশ্য সঙ্কর [hybrit] বীজ আর কৃত্রিম সারের পক্ষেই প্রচার চালাবেন— কারণ আমরা তো জানি মন্টেক সিং

আবার জিডিপি-র বৃদ্ধি হলে খুবই সুখী হন। আমাদের গৃহীত কৃষি মডেলটিতে সময়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে প্রয়োজনীয় রদবদলের ব্যবস্থাও সুনিশ্চিত করা দরকার। বিশ্বের উষ্ণীভবন [Global warming] প্রতিরোধের জন্য রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের বহুল প্রয়োগ থেকে সরে এসে প্রাকৃতিক উৎসের দিকে যেতে হবে। এরপর যদি কৃষিকাজকে যুক্ত করা হয় প্রত্যক্ষ আর্থিক সহায়তার সঙ্গে তখনই সেটি আর্থনীতিক বিচার প্রয়োগসাধ্য হয়ে উঠবে। এ-ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বিপণন [marketing]। এ ব্যাপারটি বহু রাজ্যে সম্পূর্ণ অবহেলিত। পাঞ্জাবের কৃষির সাফল্য কিন্তু শুধুমাত্র উচ্চফলনশীল উর্বর জমি আর জলসেচের জন্য নয়। এর সাফল্যের উৎস রয়েছে এর নিশ্চিত বাজার আর শস্যের উপযুক্ত দামের মধ্যে। পাঞ্জাবে প্রতি দশ কিলোমিটার পর পর একটি বড়ো বাজার বা মণ্ডি রয়েছে। পাঁচ-ছটি এজেন্সি সেখানে প্রতিবছর গম ও চালের মতো শস্য সংগ্রহ করে চলেছে। যে ব্যাপারটি আগ্রহ জাগিয়ে তোলে, তা হলো এই মণ্ডিগুলোরও নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখার প্রবণতা রয়েছে। পাঞ্জাবে রয়েছে পরস্পর-যুক্ত রাস্তার সুসমন্বিত জালের মতো বিন্যাস [network] যার ফলে কৃষকদের কৃষিজ দ্রব্য পরিবহন সহজতর হয়। ১৯৮৩-৮৫ সালে পাঞ্জাবে অর্থনীতিবিদ এস এস জনের নেতৃত্বে যে জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চা (study) হয়েছিল, তাতে পাঞ্জাবের কৃষিকে শুধু গম আর চাল উৎপাদনে সীমিত না থেকে প্রাণী, উদ্ভিদ ও তাদের পরিবেশের মধ্যেকার সামগ্রিক সম্পর্ককে যথাসম্ভব অবিকৃত রেখে শস্যের বিচিত্রায়ণের পথে এগিয়ে আসার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পাঞ্জাবের কৃষকেরা তা করেনি। অর্থনীতিবিদেরা নানা পরামর্শ দিতে পারেন। কিন্তু পাঞ্জাবের কৃষকদের প্রয়োজন তাদের জীবিকা অর্জন এবং সেটি ধান ও গম চাষে সুনিশ্চিত। আমার তো সন্দেহ হয় বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের কৃষকেরা কখনও সরকার ঘোষিত দাম পেয়েছে কি না। কারণ সেখানে তো মণ্ডি নেই, সেটি অবস্থার উন্নতির জন্য একান্তই জরুরি। প্রত্যেকবার ফসল ফলার সঙ্গে সঙ্গেই যদি ফসল সংগ্রহ হয়, তবেই তো বাজারে দাম পাওয়া যাবে।

পরের বিষয় হলো প্রযুক্তি। উৎপাদন বাড়াবার নাম করে নব্য প্রযুক্তিগুলো আসলে কী করছে সেটা বিচার করা দরকার। আমাদের বলা হচ্ছে পৃথিবীকে ভবিষ্যৎ সঙ্কট থেকে বাঁচাতে জিএম শস্যের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনসংখ্যা খুবই বেশি হারে বাড়ছে, আমাদের উৎপাদন বাড়াতে হবে আর তার জন্যই প্রয়োজন জিএম শস্য। কিন্তু এখন পৃথিবীর জনসংখ্যা ৭০০ কোটি, আর আমাদের ১১২০ কোটি লোককে খাওয়ানোর পক্ষে যথেষ্ট খাদ্য রয়েছে। তাই ২০৫০ সালে কী ঘটতে চলেছে বলে যে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে তা নিয়ে আমাদের এখন উদ্‌বিগ্ন না হলেও চলবে। উৎপাদনশীলতা বাড়াবার জন্য তত মাথা না ঘামিয়ে আমাদের দরকার খাদ্যের সুষ্ঠু বণ্টনকে সুনিশ্চিত করা। এ বছর জুন মাসে আমাদের উদ্‌বৃত্ত খাদ্যশস্যের পরিমাণ ছিল ৮২.৪ মিলিয়ন (৮ কোটি ২৪ লক্ষ) টন। কিন্তু এই খাদ্যের সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থার জন্য আমাদের দিক থেকে কি কোনো সচেতন প্রয়াস ছিল? আমরা তো বলি আমাদের আরও খাদ্য উৎপাদন প্রয়োজন বেশ কিছু শিল্পের জন্য যারা খাদ্যদ্রব্য থেকে লাভ করে, ক্ষুধার্তদের মুখে খাদ্য জোগাবার জন্য নয়। আমরা খাদ্যশস্যের বৃদ্ধির কথা সারাক্ষণ আউড়েই চলেছি সেজন্যই। এখন সমস্যাটা বৃদ্ধির নয়, খাদ্যের বণ্টনের—মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুকে সরিয়ে আনতে হবে বণ্টনের দিকে। ভারতে এখন কুড়ি কোটি লোক ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুমোতে যায়। আর তাদের সবাইকে খাওয়াবার মতো খাদ্য আছে আমাদের। তাহলে এখনই না করে সমস্যা সমাধানের জন্য আরও দশবছর অপেক্ষা করছি কেন? আমেরিকাতেই হোক আর ভারতেই হোক খাদ্যশস্য যথেষ্ট আছে, তাহলে খাদ্য উৎপাদন বাড়াবার জন্য আমাদের জিএম শস্য চাই-ই চাই, যখন আসল সত্য হলো এই যে আমাদের জিএম শস্যের আদৌ প্রয়োজন নেই, আর জিএম শস্যে উৎপাদনও বাড়ে না। বিটি তুলোর ক্ষেত্রে,আমি আপনাদের নিশ্চিত ভাবে বলিতে পারি যে উৎপাদনশীলতা একটুও বাড়েনি। একজন বিজ্ঞানী হলে আপনি উৎপাদনশীলতা কি, সেটা নিশ্চয়ই বুঝবেন। উৎপাদনশীলতা বিটি বীজ,আর রাসায়নিক সার ও কীটনাশক দিয়ে বাড়ানো যায় না। যে প্রশ্ন উঠতে পারে, যদি মেনে নেন জৈব সার আর কীটনাশক উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে দেয়, তাহলে তো এটাও মানতে হয় রাসায়নিক সার ও কীটনাশকও উৎপাদনশীলতা বাড়াবে। কিন্তু মূল বিষয়টি সেখানে নয়। আসল কথা হলো, কেউ যদি উদ্ভিদের প্রজাতিগুলোকে কব্জা করে মেধাস্বত্ব কায়েম করতে পারে তাহলে সম্পূর্ণ খাদ্য শৃঙ্খলের লাগামটা তার হাতে। এখন সেই খাদ্য শৃঙ্খলের নিয়ন্ত্রণটা মোটামুটি তিনরকম কোম্পানির হাতে— এক নম্বর হলো মনসান্টোর মতো বীজ উৎপাদনের কোম্পানিগুলি, দু'নম্বর হলো বাণিজ্যের কোম্পানিগুলি আর তিন নম্বর হলো ওয়াল-মার্ট আর সুপার মার্টের মতো বিপণনের কোম্পানিগুলি।

আমরা এর মধ্যেই দেখেছি কীভাবে এই তিন রকমের কোম্পানি সারা বিশ্বের খাদ্যের শৃঙ্খলটি নিয়ন্ত্রণ করছে। এতদিন পর্যন্ত তারা আলাদা ভাবে অংশগ্রহণ করছিল--- এখন তাদের মধ্যে মিলেমিশে যাবার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এমন সময় আসছে যখন বলা হবে আর্থনীতিক বিকাশে কৃষকদের কোনো প্রয়োজন নেই— ওদের অন্য কাজে লাগিয়ে দাও। মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় এর মধ্যে আগামী দিনে বিশ্বে খাদ্যের কারখানাগুলো কেমন হবে, তার একটি নমুনা তৈরি করে ফেলেছে। এ এমন এক খাদ্যের কারখানা যেখানে মাটি লাগে না, খেতও লাগে না। এ কারখানা হলো ১৭ তলা এক অট্টালিকা যেখানে একতলা থেকে আসবে বীজ আর সতেরো তলা থেকে আসবে চূড়ান্ত উৎপাদনটি যা ইডলিও হতে পারে, পিৎসাও [Pizza] হতে পারে। এই হলো ভবিষ্যতের খাদ্য-কারখানা। বিশ্ব ব্যাংক এখন থেকেই চিন্তা করছে এই কারখানা গঠনে কী ভাবে অর্থ সাহায্য করা যায়। আর এইরকম একটি খাবারের কারখানা যদি লস এঞ্জেলিস-এর পক্ষে যথেষ্ট হয়, তাহলে একদিন কলকাতাতেও যে এমন একটি কারকানা চালানো হবে— এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। এই ব্যাপার যদি চলে সারা বিশ্ব জুড়ে, তাহলে একজন মানুষ একক ভাবে কী করতে পারে? আফ্রিকার সেই বিখ্যাত প্রবাদটি স্মরণ করে একজন ছাত্র, একজন বিজ্ঞানী, এবং একজন একক সত্তা হিসেবে কল্পনা করার চেষ্টা করুন— আপনি একটি কামরায় ঘুমোচ্ছেন, ঘরে একটি মাত্র মশা। আর সেই একটি মশাই আপনার জীবন নরকের মতো দুর্বিষহ করে তুলেছে। একটি মশাই যদি এতটা করতে পারে আমরা সবাই মিলে কি কিছুই করতে পারি না? আমি মনে করি আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু করার দায়িত্ব আছে।

তা যদি না থাকে, তাহলে এখানে তো সামনেই পুজো, আপনারা মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা করুন— মা, আমাকে ইউরোপ বা আমেরিকার গোরু করে দাও— আরামে থাকব। □

# শিক্ষা, বৈষম্য এবং রাজনীতি

ব্রতীন চট্টোপাধ্যায়

বাঙালির অসংখ্য বিলাসের মধ্যে অন্যতম—গ্রামীণ জীবনের সরলতা ও শিক্ষাক্ষেত্রে পবিত্রতা। প্রায় ধর্মীয় আবেগে এই দুটি ভাবনা বিলাসে আমরা মথিত হতেই ভালোবাসি তার কারণ এরই মধ্যে দিয়ে আমাদের ঔপনিবেশিকতা বিরোধী মন নিজেকে প্রকাশ করে। ঔপনিবেশিত বাঙালির ইতিহাস আর তারই মন্থনই তো সম্বল আজকের দিনে। তবে দেশ ইতিমধ্যে স্বাধীন হয়েছে প্রায় ৬৫ বছর হয়ে গেছে, এবং প্রায় কয়েক কোটি বার উচ্চারণ করে ফেলেছি—চিত্ত যেথা ভয়শূন্য... ইত্যাদি। এই উচ্চারণও স্মৃতিমন্থনেরই পবিত্র মন্ত্র। স্বাধীন দেশে ঐ চিত্তর যেথা ভয়শূন্য... ইত্যাদির' প্রতিশ্রুতি হিসাবে সংবিধানও রচিত হয়েছে ৬০ বছর হলো। স্বাধীনতা-পূর্ব দেশের গ্রাম স্বাধীনতা-উত্তর দেশে ক্রমশ শহরের কাছাকাছি অথবা শহরের পরিবর্তিত— গ্রামোন্নয়ন সম্বন্ধে আমাদের ধারণাই এই পরিবর্তনকে সমর্থন করে এসেছে। পরিবর্তনের এই ভাবনার মধ্যে দিয়েই আমরা জীবনযাপনের সমান অধিকার, দেশের অগ্রগতিতে অংশীদারীর অধিকারী। দেশের সংবিধান থেকেই দেশ পরিচালনার রীতিনীতি সক্রিয় হয়, এমনটাই হওয়ার কথা। আর তার জন্যই তো স্বাধীনতা চেয়েছি। অবশ্যই এই সব রীতিনীতি সম্বন্ধে আমরা সন্তুষ্ট না হতেই পারি,আপত্তি জানাতে পারি। আর সেই আপত্তির মধ্যেই এই সব রীতিনীতিকে মেনে চলার একটা দাবিও রয়েছে, বিশেষ করে সে দাবির মধ্যে যদি সেই 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য... ইত্যাদি'র সঙ্কল্প থাকে। আমাদের আপত্তি যদি, আমাদের ব্যক্তিগত হয় তাহলে একরকম আর তা যদি সামূহিক হয় তাহলে অন্য রকম, মুস্কিল হলো কোন্‌টা আমাদের ব্যক্তিগত আর কোনটা সামূহিক তার বিচার সব সময় করে উঠতে পারি না ফলে আমাদের ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ঘটলেই প্রতিবাদী হয়ে উঠি, প্রতিবাদী হয়ে এসেছি আর এরই মধ্যে সংবিধান রচনার ৬০টা বছর কেটে গেছে।

এই সংবিধানেই তো সকলের জন্য গুণগত শিক্ষার আয়োজনের সঙ্কল্প ছিল, সেই ১৯৫২ সাল থেকেই। সংবিধানের সঙ্কল্প মেনেই ২০০৯ সালে তার আয়োজন হয়েছে, শিশুশিক্ষা আইন রচিত হয়েছে। তার পরেও ৩টি বছর কেটে গেছে। চিত্ত যেথা ভয় শূন্য সেই দেশের জন্য কি প্রত্যেক শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা থাকার দরকার নেই? আমরা, মানে আমজনতা কিন্তু এই নিয়ে প্রতিবাদী হইনি, ২০০৯ সালের পরেও আইনের রীতিনীতি অনুযায়ী সেই ব্যবস্থা রূপায়ণের দাবিও করিনি। ধরেই নিয়েছি, আইন যখন হয়েছে তখন এসব নিজে নিজেই হয়ে যাবে— ব্যক্তিগত এই ভাবনা ব্যক্তিস্তরেই থেকে যায়নি সামূহিক কোনো আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠেনি। যা হয়েছে, তা হলো এই সূত্রে যে সরকারি চাকরির সুযোগ ঘটেছে তাকে ঘিরে জল্পনা। সকলের জন্য শিক্ষা—শেষ পর্যন্ত চাকরির সুযোগেই পর্যবসিত হয়েছে অথচ এরই মধ্যে সমাজ পরিবর্তনের, দেশ পরিবর্তনের একটা সঙ্কল্প ছিল। এরই মধ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তন রচনার একটা সুযোগ রয়েছে। সমাজের একটি বিশেষ অংশ শিক্ষার সুযোগ পেয়ে এসেছে সেই ঔপনিবেশিক কাল থেকেই, এবং তার পরিবর্তনের সঙ্কল্প করা হয়েছে এই সাংবিধানিক আইনে। সাম্য আধুনিকতার লক্ষণ; সকলের জন্য শিক্ষা— এই সঙ্কল্পই আধুনিকতার লক্ষণ। স্বাধীন হলেও বোধহয় আমরা এখনও আধুনিক হয়ে উঠতে পারিনি ফলে দেশের প্রতিটি শ্রেণিকক্ষেই বৈসাম্য। দেশ ও তার সংবিধানের মাধ্যমে সেই বৈসাম্যকে প্রশ্ন করতে উদ্যোগী হলেও, এই সমাজ বোধহয় সেই বৈসাম্যকে লালিত করতে পছন্দ করে, যেমন পছন্দ করে গ্রাম সমাজের সরলতা এবং শিক্ষাক্ষেত্রের পবিত্রতা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু ভাবনা। শিক্ষাক্ষেত্রের পবিত্রতা দাবির সঙ্গে যে কথা শিক্ষাক্ষেত্রের পবিত্রতা দাবির সঙ্গে যে কথাটা গোড়ায় তা হলো— শিক্ষাক্ষেত্রে 'রাজনীতি'। এই রাজনীতি বলতে আমরা কিন্তু গোষ্ঠীগত রাজনীতির প্রসঙ্গই উথাপন করি, কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে যে ক্ষমতার রাজনীতি 'সকলের জন্য শিক্ষাকে' প্রতিনিয়ত খর্ব করছে তার প্রসঙ্গটা অনুচ্চারিতই থেকে যায়। অথচ, তারই মধ্যে যে ক্ষময়তায়নের সাম্যের প্রসঙ্গ রয়েছে তাই গোষ্ঠীগত রাজনীতিকে দিকনির্দেশ করতে পারে। শব্দের আড়ালে যে কথাটা গোপন থেকে যাচ্ছে তাকে স্পষ্ট করতে গেলে সরাসরি বলতে হয় যে— বিদ্যালয় কক্ষে অনুসূচিত বর্গের কোনো ছাত্রকে পেছনের সারিতে বসতে বলার মধ্যেও যেমন রাজনীতি রয়েছে তেমনই কোনো বালিকাকে—'তুই আর পড়ে কি করবি? বিয়ে করে ঘর-সংসারই তো করবি শেষে!' বলার মধ্যেও রাজনীতিই রয়েছে। এই রাজনীতিও গোষ্ঠীগত ভাবেই চালিত। সমাজের উচ্চবর্গ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং পরিকল্পিত ব্যবস্থায় যে শুধু অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেই এই যে বাধাগুলি তোলা হয় তার যুক্তি হলো--- সামাজিক ব্যবধানের বাধাগুলিকে বজায় রাখা। এ যুক্তি রাজনৈতিক, সামাজিক বৈষম্য বজায় রাখার রাজনীতি কখনও জাতপাতের ভাষা অবলম্বন করে, কখনও লিঙ্গ বৈষম্যের। সামাজিক স্তরে এই রাজনীতি গোষ্ঠীগত ভাবেই সংঘটিত। বিদ্যালয়ে ভরতি হলেই বা সেখানে পাঠগ্রহণ করলেই যে সাধারণ সক্ষমতা যেমন, লিখতে পারা, পড়তে, শুনতে পারার ন্যূনতম যোগ্যতা অর্জিত হয় না তথা হচ্ছে না সেই সংবাদটি 'প্রথম'-এর শেষ প্রতিবেদনে ধরা পড়েছে। যেটা ধরা পড়েনি তা হলো, সামাজিক বিন্যাস অনুযায়ী কোনো কোনো স্তরের শিশুদের ক্ষেত্রে এমনটা ঘটছে? এমনটা সামাজিক-আর্থিক স্তর নির্বিশেষে সমস্ত শিশুদের জন্য না হওয়াটাই

স্বাভাবিক। এমন মনে হওয়ার কারণ, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এখনও সংস্কৃতি-নিরপেক্ষ বা সামাজিক-স্তর-নিরপেক্ষ হয়ে ওঠেনি। তার, চেষ্টা যে হচ্ছে না এমন নয় কিন্তু সেখানেও ওই বৈষম্য বজায় রাখার রাজনীতি সমানেই সক্রিয়। এই সক্রিয়তা যে সবসময় সচেতন এমন নয়, আমাদের অজান্তেই এই বৈষম্যের রাজনীতিতে আমরা জড়িয়ে পড়ি। কিছুদিন আগের প্রচলিত ষষ্ঠ বর্গের পাঠ্যপুস্তকে 'সমাজের বন্ধু' শীর্ষক একটি অধ্যায় ছিল। সেই অধ্যায়ের পাঠ-উদ্দেশ্য— সমাজের গড়ন সম্বন্ধ ধারণা তৈরি করা। এই অধ্যায়ে সমাজের বন্ধু হিসাবে যে সমস্ত মানুষের উল্লেখ রয়েছে তারা এক একটি পেশার সঙ্গে যুক্ত যেমন, কামার, ছুতোর, চাষি ইত্যাদি। এই অধ্যায়টি আমরা দীর্ঘদিন ধরে শ্রেণিকক্ষে পড়িয়ে এসেছি কখনই আমাদের মনে হয়নি যে এর মধ্যে এক ধরণের সামাজিক বর্গীকরণের রাজনীতি রয়েছে? আমাদের কখনই খেয়াল হয়নি যে সেই শ্রেণিতে কোনো এক ছুতোর বা কামার অথবা চাষির সন্তানও এসে বসতে পারে? সমাজের বন্ধু হিসাবে, আমরা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা অফিসের বাবুর উল্লেখ করিনি তার কারণ হিসাবে এটাই কি বলতে চেয়েছি যে ওই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারের সমাজই আসলে মূল সমাজ এবং ছুতোর, কামার ইত্যাদিরা সেই সমাজের বন্ধু মাত্র। বলাবাহুল্য এই বলাটাকেই সামাজিক বৈষম্য বজায় রাখার রাজনীতি হিসাবে চিহ্নিত করতে চাইছি যার সঙ্গে আমরা অসচেতন ভাবেই জড়িয়ে রয়েছি।

শিক্ষার আইন, এক সমানতা এবং সম-অংশীদারীত্বের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছে সাংবিধানিক স্তরে, প্রশ্ন হলো দেশের সাধারণ নাগরিক কি ভাবে সেই প্রসঙ্গের প্রতি তাদের সমর্থন জানাবে? অনেকদিন আগে, শিক্ষার অধিকারের একটি সক্রিয় মঞ্চ থেকে শিক্ষার অধিকারের দাবিটি কিভাবে তোলা যায়, এর আইনি প্রেক্ষিতই বা কি সেটা সম্যক ভাবে বুঝতে বেঙ্গালুরু জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের সঙ্গে এক আলোচনায় যোগ দিয়েছিলাম। অধ্যাপক, শিক্ষার অধিকারের সাংবিধানিক, আইনি প্রেক্ষিত সম্বন্ধে বিশদে আলোচনা শেষ করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন— 'আপনি তো বাঙালি? আপনাদের বিদ্যাসাগর তো বিধবা বিবাহ প্রচলনের আইনের জন্য দাবি করেছিলেন। আইন হয়েওছিল কিন্তু তারপর? বিধবা বিবাহ কি সকলে মেনে নিল?' রাজনৈতিক স্তরে আইন প্রণয়ন শুরু হলেও তার রূপায়ণ হয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা মাধ্যমে। রূপায়ণ তথা প্রয়োগ অনিবার্য ভাবে দুটি পক্ষের নির্মাণ করে— আর তার মধ্যে দিয়েই এক ধরণের রাজনীতি গড়ে ওঠে। রাজনীতি সবসময়ই ক্ষমতার অধিকার দাবি করে। এক্ষেত্রেও তাই। এখনই একটা সংবাদ দেখছি— বাঁকুড়ার একদল মানুষ সেখানে স্থানীয় ভাষার একটি বিদ্যালয়ের দাবিতে পথ অবরোধ করেছেন। রাজনৈতিক দাবিতে পথ অবরোধের ভাষার সঙ্গে আমরা পরিচিত কিন্তু যেটা অপরিচিত তা হলো দেশের শিশুশিক্ষার আইন দ্বারা স্বীকৃত মৌলিক অধিকারের জন্য কেন পথ অবরোধ করতে হচ্ছে? শিক্ষা, শুধু কতগুলি দক্ষতা অর্জন আর নয়। শিক্ষা, সামাজিক ক্ষমতায়ন। আর, সেই ক্ষমতার সক্ষমতার দাবিতে এই অবরোধ নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক ব্যঞ্জনাযুক্ত। অবধাতি ভাবে এই অবরোধের একটি প্রতিপক্ষও রয়েছে, যার কাছে এই দাবি করা হচ্ছে। সেই পক্ষের এই বিদ্যালয়টি না করার নিশ্চয়ই কিছু যুক্তি রয়েছে; সেই যুক্তিই এই বাদপ্রতিবাদের সঙ্গে সংপৃক্ত রাজনীতি। আইন প্রণয়নের পরেও বিধবা বিবাহ নির্বিবাদে স্বীকৃত না হওয়ার পেছনেও এই রকম কোনো ক্ষমতার রাজনীতি সক্রিয় ছিল।

এখনই আর একটি সংবাদ দেখছি, এক রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী সগর্বে ঘোষণা করছেন যে— 'রাজ্যের প্রতি ৩ কিলোমিটারের মধ্যে বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে! শহর, গ্রাম নির্বিশেষে!' মুগ্ধ শ্রোতা, আমজনতা সে কথা শুনলেন এবং ক্ল্যাপ দিলেন। আমজনতা, যদি মুগ্ধতা কাটিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন— 'এই বিদ্যালয় তো দেশের আইন অনুযায়ী অনেক আগেই হয়ে যাওয়ার কথা, এতোদিন হয়নি কেন?'— সেই জিজ্ঞাসা, বিরোধী রাজনীতির বয়ান হিসাবেই খবরের কাগজে পরের দিন ছাপা হতো। এই প্রশ্নের মধ্যেও অবশ্য রাজনীতি রয়েছে, তবে তার মাত্রা ভিন্ন। এই রাজনীতির ভাব ও ভঙ্গি একমাত্রিক নয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে পবিত্রতা রক্ষা তথা রাজনীতির প্রবেশ সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি ওই একমাত্রিক রাজনীতির প্রসঙ্গে নিয়োগ করেই আমরা শুদ্ধবাদীরা আমাদের মতপ্রকাশ করে থাকি। কিন্তু, শিক্ষা বিষয়টিই যে রাজনৈতিক; সমাজের স্থির জমিতে ফাটল ধরানোর, সমাজের বদলের উদ্দেশবাহী শিক্ষার এই ভূমিকা সম্বন্ধে খেয়াল থাকে না। সম্ভবত, শিক্ষাক্ষেত্রে আরও রাজনীতির দরকার। শিক্ষাকে, সামাজিক ক্ষমতায়নের আয়ুধ হিসাবে বিবেচনা করার দাবিতেই রাজনৈতিক প্রস্তাব নেওয়া দরকার। গুণগত শিক্ষা, সমান অধিকারের শিক্ষার দাবিতে আরও অনেক পথ অবরোধ হওয়া দরকার। □


বাণিজ্যিক নয় মানবিক

# স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক বাংলা পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান : পাতিরাম, বুকমার্ক, পিপলস বুক সোসাইটি, বইচিত্র (কলেজ স্ট্রিট)

পাভলভ মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টার (মহাত্মা গান্ধী রোড) অমর কোলের স্টল (বিবাদি বাগ) অম্লান দত্ত বুক স্টল (বিধান নগর পুরসভা)

শ্রমিক কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (চেঙ্গাইল), হাওড়া ও শিয়ালদহ সেকশনের বিভিন্ন বইয়ের স্টল।

গ্রাহক চাঁদা : ১৫০ টাকা (ডাকখরচ সহ। কলকাতার বাইরের চেকের জন্যে অতিরিক্ত ৩০ টাকা)।

পাঠক ও এজেন্টরা যোগাযোগ করুন : ৯৮৩০ ৯২২১৯৪ বা ৯৩৩১ ০১২৫৩৭

# ওষুধের নাগাল মিলবে কবে, কিভাবে

শুভজিৎ ভট্টাচার্য

ওষুধের উৎপাদন ও ব্যাবসার নামে সাধারণ মানুষ প্রতিদিন যে শোষণের শিকার হচ্ছে এবং কেন বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির যুগে দাঁড়িয়েও ওষুধ কিনতে গিয়ে মানুষকে সর্বস্বান্ত হতে হবে, যখন সহজেই সস্তা ওষুধ পাওয়া সম্ভব। এ-দেশে তামিলনাড়ুর মতো রাজ্য যা পারে রাষ্ট্র তা কেন পারে না? আসলে মানুষের সচেতনতাই পারে অসুখ নিয়ে অন্যায় বাণিজ্যের নাগপাশ থেকে মুক্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। এখানে ওষুধের দাম কেন বাড়ে, জেনেরিক ও ব্র্যান্ডেড ওষুধের তফাত কোথায়, ওষুধের বাজারের বৈশিষ্ট্য ও ওষুধ কি ভাবে সস্তা হওয়া সম্ভব, তামিলনাড়ু মডেল ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা। — সম্পাদক।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তার ২০০৪ সালের বিশ্ব ওষুধ প্রতিবেদনে দেখিয়েছে, ভারতই পৃথিবীর এমন একটি দেশ যেখানে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ (৬৪ কোটি ৯০ লক্ষ) অত্যাবশ্যক ওষুধ ব্যবহার করার সুযোগ পান না। অথচ ভারত আজ বিশ্বের ৪র্থ বৃহত্তম ওষুধ উৎপাদক দেশ এবং ২০০টি দেশে রফতানি করা হয় সেই ওষুধ। এটা স্পষ্ট যে, ওষুধ দেশে তৈরি হয় কি না, কিংবা তা বাজারে মেলে কি না, এ দেশের মানুষের ওষুধ পাওয়ার ক্ষেত্রে এগুলো আদৌ মূল বাধা নয়। বরং বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে দরিদ্র জনসংখ্যার স্বাস্থ্যখাতে খরচের একটা বড়ো অংশ যায় ওষুধের খাতে। এবং এই খরচের বেশির ভাগটাই রোগীকে তার পকেট থেকে দিতে হয়। ফলে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে ওষুধের দামই ভারতবাসীর আধুনিক চিকিৎসা পাওয়ার প্রধান অন্তরায়। প্রতি বছর ২.২ শতাংশ ভারতবাসী চিকিৎসা ব্যয় সামলাতে গিয়ে দারিদ্র্য সীমার নীচে নেমে যাচ্ছেন— এক যুগ আগেই ভয়ংকর এই তথ্যটা উঠে এসেছিল বিশ্ব ব্যাংকের সমীক্ষায় (*India : Raising the Sights : Better Health Systems for Indias Poor*, World Bank, May, 2001)। পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ কারণ, ভারতে স্বাস্থ্যখাতে ব্যক্তিগত খরচ ৮৪ শতাংশ, যেখানে সরকারি খরচ মাত্র ১৬ শতাংশ। সারা বিশ্বের মধ্যে ব্যক্তিগত খরচের এই অনুপাত সবচেয়ে বেশি। উপভোক্তা খরচের উপর জাতীয় নমুনা সমীক্ষায় (NSS, 55) দেখা গিয়েছে, গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্য ব্যয়ের ৭৭ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৭০ শতাংশ একক ভাবে ওষুধ কিনতে খরচ হয়। গরিব মানুষ হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা কোনো দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্রে দেখালেও ওষুধ কিনতেই হয়। মানুষের দারিদ্র্য যত বাড়ে, ওষুধ ক্রয়ের ভাগ তত বাড়ে।

আমাদের দেশের সাধারণ চিকিৎসা পদ্ধতি হলো রুগী চিকিৎসকের কাছে গেলে তিনি রুগীকে দেখে একটি প্রেসক্রিপশন করে দেন যার ভিত্তিতে দোকানে বা কোনো সরকারি/দাতব্য ফার্মেসি থেকে রুগী ওষুধ সংগ্রহ করেন। বেশির ভাগ সময় শিক্ষিত মানুষেরাও বুঝতে পারেন না তারা কি ওষুধ খাচ্ছেন। ওষুধের পাতার ওপর বড়ো অক্ষরে লেখা নামটি দেখে তারা ভাবেন সেটাই ওষুধ। আসল ওষুধটি কি সত্যিই তাই? না, তাই নয়। ভারতের বাজারের প্রচলিত আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ওষুধের বড়ো অক্ষরে লেখা নামের আড়ালে ছোটো অক্ষরে লেখা নামের মধ্যেই আছে তার আসল পরিচয়।

### জেনেরিক ওষুধ কি?

যে কোনো ওষুধ আসলে একটি রাসায়নিক যৌগ। এই রাসায়নিক যৌগটি ডাক্তারি শাস্ত্রসম্মত হওয়া দরকার। যে কোনো ব্র্যান্ডেড ওষুধে এই রাসায়নিক কম্পোজিশনের উল্লেখ থাকে। আর ব্র্যান্ড হলো প্রস্তুতকারী সংস্থার দেওয়া নাম। ওষুধটি যখন তার মূল রাসায়নিক নামে অর্থাৎ অব্যাবসায়িক নামে (ইন্টারন্যাশনাল নন-প্রপাইটিারি নেম— INN) বাজারে পাওয়া যায় তাকে বলে জেনেরিক ওষুধ। এই নামটি অনেক সময় তার ওষুধশাস্ত্রীয় নামও হতে পারে। এই ওষুধটির ভেষজ উপাদানঅর্থাৎ ডোজ, কার্যকারিতা, পার্শ্ব- প্রতিক্রিয়া, নিরাপত্তা ব্র্যান্ডেড ওষুধটির সঙ্গে সমান।

ডায়াবেটিস ম্যালাইটাস রোগের একটি জেনেরিক ওষুধ হলো মেটফরমিন। ওষুধটি বাজারে গ্লাইসিফেজ, বাইগুমেট ইত্যাদি ব্র্যান্ডে পাওয়া যায়। জ্বর কমানোর চালু ওষুধ প্যারাসিটামল (ওষুধশাস্ত্রীয় নাম) বা এসিটোমেনোফেন নামে যখন বিক্রি হয় তখন তা জেনেরিক কিন্তু ক্রোসিন, ক্যালপল ইত্যাদি বিভিন্ন কোম্পানির দেওয়া ব্র্যান্ড নাম। উচ্চ রক্তচাপ কমানোর সবচেয়ে প্রচলিত জেনেরিক ওষুধটি হলো অ্যাম্লোডেপিন যা বাজারে অ্যাম্লোকাইন্ড, স্ট্যাম্লো ইত্যাদি ব্র্যান্ড নামে পাওয়া যায়।

আমরা আসলে ব্র্যান্ড খাই না, খাই ওষুধটি, যা অসুখ সারায়। ডাক্তারি পড়াশুনা, পরীক্ষা, গবেষণা, ডাক্তারদের পারস্পরিক আলোচনা সবই হয় জেনেরিক নামে। শুধু দোকানে কিনতে গিয়ে দেখবেন ব্র্যান্ডের ছড়াছড়ি। কেন এমন হয়, আর মানুষের চিকিৎসায় এর প্রভাব কি? প্রায় ২০ হাজার ওষুধের কোম্পানি এক লাখের ওপর ফর্মুলেশনস--এর ওষুধ বাজারে বিক্রি করে অথচ লক্ষ লক্ষ মানুষের নাগালের বাইরে ওষুধ কারণ সেগুলি ক্রয় করার সামর্থ্য তাদের থাকে না। ওষুধের ব্যাপক উৎপাদনও দেশের চাহিদা পূরণের কোনো উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেনি। এই পরিস্থিতির প্রধান কারণ হলো এই যে, অধিকাংশই উৎপাদিত ফর্মুলেশন অপ্রয়োজনীয়, যুক্তিহীন, খুবই ব্যয়বহুল এবং ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। এটা ঘটনা যে, সক্রিয় ফার্মাসিউটিকাল উপাদানগুলির (API) সংখ্যা মাত্র ৫৫০। উপাদানগুলোর প্রকৃত সংখ্যা এত কম হওয়া সত্ত্বেও এত বৃহৎ সংখ্যক ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য

(ওষুধ না বলে এদের পণ্য নামেই বলা ভালো) আসলে ডাক্তার এবং রুগীর অজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে চিকিৎসার নামে শোষণ ও মুনাফা করার উপায়। এটা হিসেব করে দেখা গেছে যে, ভারতের বাজারে চালু ওষুধের মাত্র ২০ শতাংশ দিয়েই বর্তমানের ৮০ শতাংশরও বেশি রোগের চিকিৎসা করা যায়। বহু বহুজাতিক কোম্পানির বিক্রীত ওষুধের শতকরা ২০-৩০ শতাংশ জীবনদায়ী। যদিও বলা হয় যে, মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে বাজারের চালিকা শক্তি ভোক্তারা এবং তারাই মূল্য স্থির করে কিন্তু ওষুধের ক্ষেত্রে তা নয়। বাস্তব হলো এই যে, একই লবণ (কেমিক্যাল কম্পাউন্ড) বিভিন্ন সংস্থা দ্বারা বিভিন্ন ব্র্যান্ড নামে বিক্রি হয়, কিন্তু বিক্রি হচ্ছে তার উৎপাদন মূল্যের ১০ গুণ বেশি দামে যার মানে হলো ১০০০ শতাংশ লাভ নিশ্চিত। এটা সম্ভব করে তোলার জন্য বিশেষ মার্কেটিং কৌশল ব্যবহার করা হয়, যার ভিতর থাকে কোম্পানির মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ বাহিনী যারা বিভিন্ন উপায়ে ডাক্তারদের প্ররোচিত করেন যাতে তারা প্রেসক্রিপশনে কোম্পানির ব্র্যান্ড লেখেন এবং অসন্দিগ্ধচরিত্র রোগীর ওই নির্দিষ্ট ব্র্যান্ড নামের ওষুধ কেনা ছাড়া কিছু করার থাকে না। অথচ কম দামী বিকল্প ব্র্যান্ডও বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। এই ভাবে ব্র্যান্ডের নামের সাহায্যে ওষুধ বাজারে একটি কৃত্রিম একচেটিয়া ক্ষমতা তৈরি হয়, যা একই পণ্যর মধ্যে মূল্য প্রতিযোগিতায় বাধা দেয় এবং এর ফলে ওই ব্র্যান্ড উচ্চ মূল্যে বিক্রি হয়। যেমন, ব্লাড ক্যান্সারের চিকিৎসায় Imatinib বলে ওষুধ লাগে এবং Glivec ব্র্যান্ডের এক মাসের কোর্সের খরচ ১,১৪,৪০০ টাকা। কিন্তু ভিন্ন ব্র্যান্ড নাম Veenat এ খরচ ১১,৪০০ টাকা এবং Cipla (@imitib) জেনেরিক সমতুল্য ওষুধ সরবরাহ করে মাত্র ৪,০০০ টাকায়। এছাড়াও Gelnmark প্রতি মাসে ওই ওষুধ বিক্রি করে ৫,৭২০ টাকায়। এই সব ব্র্যান্ডে থাকে একই লবণ একই পরিমাণে, একই মানে Imatinib, এবং প্রত্যেকটি সমানে ভাবে কার্যকর।

জেনেরিক ও ব্র্যান্ড ওষুধের আসল তফাত হলো তার দামে। কখনও কখনও ব্র্যান্ডেড ওষুধের দাম ২ থেকে ৫ গুণ বেশি। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে তাহলে ওষুধের মানের ক্ষেত্রে জেনেরিক ওষুধের কোনো ঘাটতি নেই তো? FDA (US ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) মনে করে জেনেরিক ওষুধ, ব্র্যান্ড নামের ওষুধের সমান কার্যকর। জেনেরিক ওষুধ সস্তা পড়ে কারণ ওষুধটির জন্য গবেষণা ও বাজারজাত করার খরচ লাগে না বললই চলে। যখন কোনো নতুন ওষুধ কোনো কোম্পানি বাজারে আনে তার আগে সেটির গবেষণায় ও বাজারে চালু করতে অনেক খরচ হয়। প্রাথমিক ভাবে সেই কোম্পানিকে পেটেন্ট দেওয়া হয় যার ফলে যতদিন পেটেন্ট থাকে ওষুধটি তৈরি ও বিক্রি করার একমাত্র অধিকারী হয় সে-ই। পেটেন্টের মেয়াদ শেষ হওয়ার কাছাকাছি সময়ে প্রস্তুতকারী সংস্থাটি FDA-কে আবেদন করতে পারে যাতে ওষুধটির জেনেরিক প্রতিরূপ সে তৈরি ও বিক্রি করতে পারে। যেহেতু ওষুধের পেছনে প্রাথমিক খরচ লাগে না, এই সময় থেকে অন্যান্য কোম্পানিরা সস্তায় ওষুধটি তৈরি ও বিক্রি করতে পারে। যখন একই ওষুধ অনেক কোম্পানি উৎপাদন ও বিক্রি করতে শুরু করে তাদের মধ্যেকার প্রতিযোগিতায় ওষুধের দাম আরও কমে। ২০০৫ সাল পর্যন্ত ভারতে কোনো পেটেন্ট আইন চালু ছিল না সেই জন্য এখানকার চিত্রটা অন্যরকম— একই ওষুধ বিভিন্ন কোম্পানি তাদের দেওয়া ব্র্যান্ড নামে বিক্রি করে। প্রতিযোগিতার জন্য এদের অনেকের দামও কম হয়। সে কারণে ভারতের বাজারের ৯৯.৫ শতাংশ জেনেরিক ওষুধ প্রকৃতপক্ষে ব্র্যান্ডেড জেনেরিক। বাজারে জেনেরিক নামে প্রেসক্রিপশন নিয়ে গেলে সহজে পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে সেটি খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে দোকানদার এবং সরকারের একটা ভূমিকা থাকে। এ প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করা যাবে। আগে দেখে নিই ভারতে জেনেরিক ওষুধের উৎপাদন ও বাজারের চিত্রটা, যা আমেরিকার থেকে অনেকটাই অন্যরকম।

**সা র ণি : ১**

| প্রস্তুতকারী কোম্পানি | কোম্পানির দেওয়া নাম (ব্র্যান্ড নাম) | সল্টের রাসায়নিক নাম (জেনেরিক নাম) | দোকানদার যে দামে কেনে (Stockist মূল্য) ১০টা ট্যাব. | দোকানদার যে দামে বিক্রি করে (১০টা ট্যাব.) |
|---|---|---|---|---|
| Cipla | Alerid | Cetrizine ১০ মিলিগ্রাম | ২৮.৮৫ | ৩৭.৫০ |
| Cipla | Cetcip | Cetrizine ১০ মিলিগ্রাম | ১.৮৮ | ৩৩.৬৫ |
| Cipla | Okacet | Cetrizine ১০ মিলিগ্রাম | ১.৮৪ | ২৭.৫০ |

### জেনেরিক ওষুধের মান

ভারতে ওষুধ উৎপাদন আমেরিকা ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় সস্তা। এখানকার মানুষও প্রচুর পরিমাণে জেনেরিক ওষুধের ওপর নির্ভরশীল। এখানকার বেশির ভাগ ওষুধ আমেরিকার FDA দ্বারা স্বীকৃত। এখানে প্রচুর ইংরেজি ভাষা জানা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ-শিক্ষিত তরুণ কর্মী পাওয়া যায়। বাস্তবে ভারত এ-ধরণের মানবসম্পদে পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম দেশ। এই কারণে ইউরোপ ও আমেরিকার বড়ো বড়ো কোম্পানির কাছে ভারত ওষুধ উৎপাদন ও বাণিজ্যের একটি লোভনীয় জায়গা। সারা বিশ্বের জেনেরিক ওষুধ উৎপাদন ও বিক্রির একটি বড়ো অংশই ভারতের। ভারতই পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি জেনেরিক ওষুধ উৎপাদনকারী দেশ। দেশের ৪০ শতাংশের বেশি লোক যেখানে দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে সেখানে ওষুধ কিনে খাওয়াটাই বেশির ভাগ লোকের পক্ষে কঠিন কাজ (জটিল এবং দীর্ঘস্থায়ী রোগ হলে তো কোনো কথাই নেই)। একমাত্র জেনেরিক ওষুধই পারে তাদের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার অধীনে আনতে। অতএব আমাদের মতো দেশে সাধারণ মানুষের আয়ত্তের মধ্যে জেনেরিক ওষুধ আসা অবশ্যই উচিত।

### জেনেরিক ওষুধের দাম

জেনেরিক ওষুধ সাধারণ ভাবে ব্র্যান্ডেড ওষুধের থেকে অনেক গুণ কম। এতটাই সস্তা যে শিক্ষিত ও সক্ষম যে শ্রেণিটি ব্র্যান্ডেড ওষুধ কিনে খায় তারা এর গুণমান নিয়ে প্রশ্ন তুলবে এটাই স্বাভাবিক। একই দেশে একই গুণমানের ওষুধের দামের এই আসমান জমিন ফারাক মানুষের ধারণার বাইরে। সরকারি নিয়মের ফাঁক দিয়ে ওষুধ কোম্পানিগুলো যে কত হাজার গুণ লাভ করে সে আলোচনার জন্য আরেকটি বই লাগবে। আপাতত ব্র্যান্ডেড ও জেনেরিক ওষুধের দামের তফাতটা দেখে নেওয়া

| ব্যবহার | জেনেরিক ওষুধ | দাম | ব্র্যান্ড | দাম |
|---|---|---|---|---|
| বেদনানাশক | প্যারাসিটামল/প্রতি ১০টা ট্যাব | ২.৪৫ | ক্রোসিন | ১১.০০ |
| | | | ক্যালপল | ১০.৭০ |
| | প্যারাসিটামল সিরাপ | ৯০০ | ক্রোসিন | ১৫.০০ |
| | | | ফেব্রেক্স | ২০.৫০ |
| | ডাইক্লোফেনাক + প্যারাসিটামল প্যারাসিটামল/প্রতি ১০টা ট্যাব | ৪.৪ | ডাইক্লোজেসিক | |
| অ্যান্টিবায়োটিক | এমোক্সিসিলিন/প্রতি ১০টা ট্যাব | ১৩.২ | LMX | ৪০.০০ |
| | | | রিমিক্স | ৩৮.৭ |
| | এ্যাজিথ্রোমাইসিন/প্রতি ১০টা ট্যাব | ৪১.৮ | অ্যাজি | ১০৭.০০ |
| | | | অ্যাজিথ্রাল | ১২৮.৫৫ |
| ভিটামিন | | ২.৮ | বিকোসুল | ১১.০০ |

| ওষুধ | প্যাক | জেনেরিক ওষুধের দাম | বাজার দাম |
|---|---|---|---|
| ট্যাবলেট সিপ্রোফ্লোক্সাসিন ২৫০ মি.গ্রা | ১০ | ১০.৪০ | ৫৫.০০ |
| ,, ৫০০ ,, | ১০ | ২০.১০ | ৯৭.০০ |
| ট্যাবলেট ডাইক্লোফেনাক ১০০ ,, | ১০ | ৩.১০ | ৩৬.৭০ |
| ,, সেন্ট্রিজাইন ১০ ,, | ১০ | ২.৫০ | ২০.০০ |
| ,, প্যারাসিটামল ৫০০ ,, | ১০ | ২.৩০ | ১০.০০ |
| ,, নিমেসুলাইড ১০০ ,, | ১০ | ২.৫০ | ২৫.০০ |
| কাফসিরাপ ১১০ মিলি | — | ১২.৫০ | ৩৩.০০ |

যাক। অল্প কিছু উদাহরণের মাধ্যমে দুক্ষেত্রে দামের তফাত দেওয়া হলো। (দ্র. সারণি:২) দামের ফারাকের আর কোনো ব্যাখ্যা শিক্ষিত সমাজ কেন অনেক ডাক্তার, চিকিৎসা-কর্মীরও নেই।

ভারতের সমস্ত এলাকায় সাধারণ ওষুধের দোকানে যে ওষুধ থাকে তার একটা বড়ো অংশই হলো জেনেরিক ওষুধ। ওষুধের দোকান থেকে আপনি নাম বলে যে ওষুধটি পান সেটি অনেক সময় জেনেরিক ড্রাগ। কিন্তু এটির দাম যে সব সময় কম পড়ে তা নয়। কেন এমন হয়? আগেই বলেছি ভারতে প্রাপ্ত বেশির ভাগ জেনেরিক ওষুধই হলো ব্র্যান্ডেড জেনেরিক। যেহেতু জেনেরিকের প্রেসক্রিপশন কম হয় বা বলা যায় ডাক্তার দিয়ে লেখানোর মতো মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ বাহিনী থাকে না, ফলে খোলা বাজারে বিক্রির জন্য বহু ছোটো কোম্পানিকে ওষুধের দোকানগুলির উপর নির্ভর করতে হয়। তাদের আর্থিক সুবিধা দেওয়ার জন্য ওই সব ছোটো ছোটো কোম্পানি ওষুধের খুচরো বিক্রি মূল্য বেশি রাখে এবং বেশি কমিশন দেয়। এক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন আছে। অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের সর্বোচ্চ খুচরো দাম কমানোর জন্য সরকারি ব্যবস্থা আছে। এ প্রসঙ্গে পরে আলোচনা হবে। সরকার সাধারণ মানুষের কাছে সস্তায় জেনেরিক ওষুধ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেও কিছুটা সুবিধা হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে সরকারের ভূমিকা হতাশাজনক। ২০০৮ সালে জনসাধারণের কাছে সস্তায় ওষুধ পৌঁছে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার জনৌষধি বলে একটি ব্যবস্থা চালু করে যাতে প্রাথমিক ভাবে ৩০০০ জনৌষধি সরকারী ঔষধাগার (outlet) তৈরির পরিকল্পনা হয়। বিগত ৫ বছরে সারা দেশে এরকম ৩০০টি কেন্দ্র চালু হলেও সরকারি উদাসীনতায় তার বেশির ভাগই এখন বন্ধের মুখে। ফলে প্রকৃত অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি।

### ওষুধ সস্তা হওয়া সত্ত্বেও কেন এত ব্র্যান্ড ও দামী ওষুধের রমরমা

ব্র্যান্ড নামের ফলে রুগীর, তার পকেট বুঝে একটি পণ্য বেছে নেওয়ার অধিকার লঙ্ঘিত হয়।যদি ডাক্তাররা ব্র্যান্ড নামের পরিবর্তে জেনেরিক নামে প্রেসক্রিপশন করেন (বিভিন্ন পণ্য ও তুলনা করা যেতে পারে) রুগী সর্বনিম্ন মূল্যে (এমনকি সর্বোচ্চ খুচরো দামের ৫-১০ শতাংশ কম) ওষুধটি পেতে পারে। এমনকি প্যারাসিটামল, লোহা, ইত্যাদির মতো প্রাচীনতম ওষুধ যার জন্য কোনো পেটেন্ট সুরক্ষা নেই তাও বাজারে চলে উচ্চ দামে। এটা করতে একটি পেটেন্ট হওয়া ওষুধের ব্র্যান্ড নাম এর সঙ্গে সংযোজন করা হয়। ভারতে ওষুধের দাম বেশি হওয়ার অনেক কারণের মধ্যে অন্যতম হলো এখানে ওষুধের ব্যবসা চলে মূলত ব্র্যান্ড নামে। এখানে না জেনে, বিভিন্ন ক্রেতা বিভিন্ন উৎপাদক দ্বারা তৈরি একই ওষুধ কেনে বিভিন্ন ব্র্যান্ড নামে ও বিভিন্ন দামে। তাদের এই অজ্ঞতার সুযোগে পকেট কাটা যায় সহজেই। ওষুধ কোম্পানি এটাই করে ডাক্তারদের কাজে লাগিয়ে। ওষুধ যে কেউ উৎপাদন ও বিক্রি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, 'প্যারাসিটামল' জেনেরিক নামের একটি ব্যাথা কমানোর ওষুধ। এটি ২০টিরও বেশি ব্র্যান্ড নামে পাওয়া যায়। Crocin, Calpol,Metacin, Pyrin ইত্যাদি। সবেতেই প্যারাসিটামল আছে। ক্রেতা, যদিও, এ সম্পর্কে সচেতন নয়। ড্রাগ কোম্পানি এবং ডাক্তার যদি বোঝায়ও যে একটি বিশেষ প্যারাসিটামল অন্যের তুলনায় আরও কার্যকর, তাহলেও সেটি ভুল, কারণ এই সব ওষুধে রাসায়নিক হিসাবে একই উপাদান থাকে এবং একই নিয়ন্ত্রিত মানের শর্ত মেনে এগুলি তৈরি হয়। একই ভাবে, Amivan, Flagyl, Aristogyl ইত্যাদি নামে বিক্রি করা হয় metronidazole।

### খুচরো বাজারে ওষুধের দামের বিভিন্নতা

একটি প্যারাসিটামল ট্যাবলেটের উৎপাদন খরচ প্রায় ১৫ পয়সা। একই ওষুধকে ব্র্যান্ডে পরিণত করে এবং বিজ্ঞাপন দ্বারা তার প্রচার করে ক্রেতার মনে প্রভাব বিস্তার করে, বিক্রি করা হয় যত সম্ভব বেশি দামে। ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি ক্রোসিন ব্র্যান্ড নামে একই ওষুধ বিক্রি করে প্রায় ১.২০ টাকায়। যা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে গ্রাহকদের কাছে বিক্রি করা হয়। বিভিন্ন কোম্পানি টেলিভিশনে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে বিজ্ঞাপন দেয় ও অন্যান্য বিপণন কৌশলের সাহায্যে মানুষের মনে ধারণা তৈরি করে দেয় যে, এটাই সর্বোত্তম। ব্র্যান্ডগুলি বাজারে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং তার খরচ বর্তায় ভোক্তার ওপর। একারণেই ওষুধ এত ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে। ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টর এই ভাবে দরিদ্র এবং অজ্ঞ ভোক্তাদের খরচে বিপুল মুনাফা করে। ব্র্যান্ড নামের সৃষ্টির ফলেই ওষুধের

উচ্চ মূল্য, বড়ো বড়ো কোম্পানির মনোপলি এবং ভোক্তাদের বেশি খরচ। ব্র্যান্ডেড ওষুধের ক্রমবর্ধমান তালিকাও বাজারে মনোপলির প্রমাণ দেয়। ধরা যাক Ciproflaxacin এর কথা — এটি অ্যান্টিবায়োটিক যা বহু সংক্রমণে ব্যবহৃত হয়। বাজারে বিক্রি প্রায় অর্ধেক Ciproflaxacin একটি কোম্পানি থেকে আসে; কার্যকর ভাবে ওই ওষুধটি ব্র্যান্ড লিডার এবং দামেও শীর্ষে। এক একটি কোম্পানি, তা Cipla, Alembic বা Glaxo যাইই হোক ব্র্যান্ড নেতা হিসাবে বাজারের বিভিন্ন বিপণন কৌশল ব্যবহার করে। খুচরো দোকানদারদের বেশি কমিশন ও ডাক্তারদের প্রচুর উপঢৌকন দেয়। এই কারণে তারা বাজার নিয়ন্ত্রণ করতেও সক্ষম হয়। এই ভাবে এমনকি উচ্চ মূল্য রাখা হলেও, মানুষ অবিরত ওষুধটি কিনতে থাকে। মুক্ত বাজারে প্রতিযোগিতার ফলে দাম কমে এবং আরও বেশি কাছাকাছি আসে। এটা জেনেরিক ড্রাগ বাজারের ক্ষেত্রে সত্যি হতে পারে কিন্তু ব্যক্তি মালিকানাধীন (ব্র্যান্ডেড) ওষুধের বাজারের ক্ষেত্রে সত্যি নয়— অন্তত ভারতের ক্ষেত্রে তো নয়ই। এখানে ব্র্যান্ড নামের দ্বারা তৈরি করা হয় কৃত্রিম মনোপলি। ফলে বেশির ভাগ ওষুধ প্রেসক্রিপশন এবং ডিসপেনসিং হয় ব্র্যান্ড নামে।

প্রকৃতপক্ষে এটাই হলো ওষুধ ব্যবসার 'ট্রেড সিক্রেট'। ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানি একই ক্ষমতাসম্পন্ন রাসায়নিক যৌগ বিভিন্ন ব্র্যান্ড নামে তৈরি করে এবং মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভদের মাধ্যমে ডাক্তারদের প্রভাবিত করে ও তাদের একটি বিশেষ ব্র্যান্ড লিখতে প্ররোচিত করে। সর্বোচ্চ খুচরো দামে (যা সংস্থা ওষুধের ফয়েলের গায়ে প্রিন্ট করে রাখে) রুগিদের ওই ব্র্যান্ড কেনা ছাড়া আর কোনো বিকল্প থাকে না। এ ছাড়া অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের মতো ভোক্তা/রুগির কোনো উপায় নেই কারণ তারা যা কিনবেন তা তারা নির্বাচন করেন না, ডাক্তার বা ফার্মাসিস্টরা সেটা ঠিক করে দেন। তাই অনেক কোম্পানি একই রাসায়নিক যৌগ উৎপাদন করলেও, কার্যত দাম নিয়ে বাজারে কোনো প্রতিযোগিতা থাকে না। ফলে সমস্ত ব্র্যান্ডগুলিই অত্যন্ত উচ্চ হারে বিক্রি হয়।

### কিভাবে চিকিৎসা দুর্মূল্য হচ্ছে

আমাদের দেশের একজন রুগিকে তার ওষুধের ৫০ থেকে ৯০ শতাংশই নিজের পকেট থেকে কিনতে হয়। ওষুধ কিনতে গিয়ে ও চিকিৎসা-খরচ মেটাতে গিয়ে বহু পরিবার ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। প্রত্যেক বছর ওষুধ কিনতে গিয়ে বহু মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে নেমে যাচ্ছে। ভারতে কন্যাপণের পর চিকিৎসায় ঋণগ্রস্ত হয় বেশি লোক। যেমন ধরা যাক কোনো ডাক্তার আন্ত্রিক রোগে ব্যবস্থাপত্র দিলেন অ্যামিকেসিন ইনজেকশান (৫০০ মিগ্রা)-এর। বাজারে যে কোনো ব্রান্ডের একটা এই ইনজেকশানের দাম প্রায় ৭০.০০ টাকা। পাঁচদিনে দুটো করে ইনজেকশানের ও তা দেওয়ার খরচ মিলিয়ে পড়ে প্রায় হাজার টাকার মতো। এদেশে বহু বহু পরিবারের পক্ষে এই খরচ বহন করা প্রায় দুঃসাধ্য। ফলে তার হয় ঋণ বাড়ে নয় প্রাণে মরতে হয়। অথচ ওষুধটির উৎপাদন খরচ ৭.০০ টাকার বেশি নয়। তাই এর প্রকৃত দাম দশ থেকে বারো টাকার বেশি হওয়া উচিতই নয়।

### এত অনাবশ্যক দামী ব্র্যান্ডও কি করে বাজারে চলে?

মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভদের প্রভাবে ওষুধ অত্যন্ত লাভজনক ব্যাবসা। আগেই বলা হয়েছে ওষুধ কোম্পানি তার মার্কেটিং বিভাগ খুলে মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ নিয়োগ করে এর পেছনে ওষুধের দামের কমপক্ষে ২০ শতাংশ খরচ করে। মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভরা ডাক্তারদের সঙ্গে ঘনঘন সাক্ষাৎ করে তাদের ব্র্যান্ড লিখতে রাজি করান। এর জন্য তারা ফ্রি স্যাম্পেল থেকে শুরু করে নানা উপঢৌকনও দেয় যেমন পেন, ডায়রি, রাইটিং প্যাড থেকে শুরু করে জামা-জুতো, ঘর সাজানোর জিনিস, মাঝেমাঝে পাঁচতারা হোটেলে কনফারেন্স ও খাওয়াদাওয়া এমনকি বিদেশ ভ্রমণেরও সুযোগ মেলে। ফলে ডাক্তারদের একটা বড়ো অংশ ব্র্যান্ড ওষুধের ওকালতি করবেন এবং দামী ব্র্যান্ড লিখবেন এটাই স্বাভাবিক।

আমাদের দেশে চিকিৎসা ও ওষুধের অগ্রগতি বা নতুন ওষুধের প্রচলন সম্বন্ধে ডাক্তারদের জানানোর সরকারি কোনো ব্যবস্থাই নেই। ফলে পড়াশোনায় অনভ্যস্ত ডাক্তাররা মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভদের শেখানো কথা মেনে নেন এবং জেনে না জেনে অনেক অপ্রয়োজনীয় এমনকি ক্ষতিকারক ওষুধও লেখেনএবং কম দামী ওষুধও যে কাজ করে এই বিশ্বাসটাই তাদের চলে যায়।

বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানিগুলির অসীম ক্ষমতার জোরে নামী ডাক্তার, রাজনৈতিক নেতা, আইন প্রণেতা এমনকি বিচারব্যবস্থাকে পর্যন্ত প্রভাবিত করে বহু অযৌক্তিক, ক্ষতিকারক নিষিদ্ধ ওষুধও বাজারে চালু রাখে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনে বেআইনি পথে হাটতেও তারা কসুর না।

### সমস্যার সাময়িক হলেও সমাধান সম্ভব

জেনেরিক নামে প্রেসক্রিপশন চালু হলে মানুষের সাময়িক সুবিধা। যে কোনো মানুষ দোকানদার ও অন্য কোনো শিক্ষিত লোকের সাহায্যে সস্তা ব্র্যান্ডটি খুঁজে পেতে পারে। এর ফলে ব্র্যান্ড নামের আড়ালে ডাক্তার ও ওষুধ কোম্পানির মিলিত প্রহসন কিছুট হলেও কম হবে। গরিব মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়লে ব্যাবসাও বাড়বে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হিসেব করে দেখেছে জেনেরিকে প্রেসক্রিপসন হলে ধনী দেশেই ওষুধের বিলে ৭০ শতাংশ সাশ্রয় হয়, আমাদের মতো দরিদ্র দেশে এটা কত গুণ তা সহজেই অনুমেয়। একমাত্র ডাক্তাররাই এর বিরুদ্ধে যাবেন। তারা রুগিদের হয়রানির অজুহাত দেবেন। একথা ঠিক, সরকার জেনেরিকের প্রাপ্যতা বাড়ালেই এর অনেকটা সুরাহা হয়। তবু রুগির অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে দামী ব্র্যান্ড না লিখে রুগি যাতে সস্তায় ওষুধটা পেতে পারে সে জন্যে ওষুধের জেনেরিক নামটা লিখে সাহায্য করলেই হয়। এতে ওষুধটা পেতে একটু খাটতে হলেও শেষপর্যন্ত পকেট বাঁচে। সম্প্রতি অবশ্য বেশ কিছু সহৃদয় ডাক্তার এই ধরণের প্রাকটিস্ করে মানুষের আস্থা লাভ করেছেন। এতে ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশান প্রাইভেসি লঙ্ঘিত হলেও মেডিকেল এথিক্স রক্ষিত হয় এবং ওষুধ কিনতে না পারার জন্য জীবনের ক্ষতি আটকানো যায়। বর্তমান লেখক এবং তার সহকর্মীদেরও অভিজ্ঞতা এটাই। ডাক্তারি পড়া থেকে করা সবটাই তো হয় জেনেরিক-নামে, শুধু রোগীকে লেখবার সময় ব্রান্ডের ব্যবহার না করলেই নয়?

সমস্ত প্রয়োজনীয় ওষুধকে ড্রাগ কন্ট্রোলের অধীনে (DPCO) আনতে পারলেই খানিকটা কাজ এগোয়। সরকারি নিয়ন্ত্রণই ওষুধ কোম্পানির লাগাম ছাড়া মুনাফায় রাশ টেনে অত্যাবশকীয় জীবনদায়ী ওষুধ মানুষের সাধ্যের মধ্যে আনতে পারে।

অনাবশ্যক ও ক্ষতিকারক ওষুধ সম্বন্ধে ডাক্তরদের মাঝেমাঝে অবহিত করতে হবে যাতে রুগির ক্ষতি বা অহেতুক খরচ না বাড়ে। কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি রাজ্য সরকারগুলিকেও অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের একটি তালিকা তৈরি করতে হবে। এ ব্যাপারে পথ দেখাচ্ছে তামিলনাড়ু।

১৯৯৬ সালে তারা রাজ্য অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের একটি তালিকা তৈরি করে। রাজস্থান, ছত্তীসগঢ়, কর্নাটকও এগিয়ে আসছে। রাজস্থান সরকার ৩৫০টি অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকা তৈরি করেছে। সরকারি হাসপাতালের ৮৫ শতাংশ ওষুধ এই তালিকার থেকে কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এছাড়া একটি Standard Treatment Guidelines তৈরি করে অনাবশ্যক ও ক্ষতিকারক ওষুধের ব্যবহার বন্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছে।

**জেনেরিক ওষুধ সস্তায় কিনে সরকারি বিপনীর মাধ্যমে সাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া হোক**

ইউনিভার্সাল হেলথ কেয়ার (UHC) সংক্রান্ত রিপোর্টে সুপারিশ করা হয়েছে 'সরকারি ব্যয় বাড়িয়ে বিনামূল্যে অপরিহার্য ওষুধ পাওয়া নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব।' জন-স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার মাধ্যমে বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ কোনো বৈপ্লবিক ঘটনা নয়। কিছু উন্নত দেশে রোগীদের জন্য বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। যেমন, স্পেনে রোগী বিনামূল্যে ফার্মেসি থেকে ওষুধ পায় যার দাম সরকার মেটায়। এমনকি যদি প্রেসক্রিপশনে অন্য ব্র্যান্ড লেখাও থাকে আইন মাফিক ফার্মেসি থেকে রোগীকে সস্তা জেনেরিক বিকল্প প্রদান করা বাধ্যতামূলক। সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদনে জানা যাচ্ছে যে নতুন ফরাসি সরকার তাদের জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় রোগীর ফার্মাসিউটিকাল বিল মেটাবে যদি তা শুধু জেনেরিক ওষুধের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে। বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ করা ভারতেও নতুন নয়। HLEG রিপোর্টের তৃতীয় অধ্যায় দেখায় যে, ১৯৮০ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তির সময়ে নির্ধারিত ওষুধের আনুমানিক এক তৃতীয়াংশ বিনামূল্যে সরবরাহ করা হতো, কিন্তু তারপর থেকে ক্রমে সেই সরবরাহ কমে গেছে। প্রতিবেদনে আরও দেখা গেছে যে, বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহের এই পতনের সাথে সাথে রোগীর যুগপৎ পকেট থেকে খরচ নাটকীয় ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। উচ্চ পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ গ্রুপের রিপোর্টে UHC সিস্টেমের একটি অংশ হিসাবে সরকার পরিচালিত হাসপাতাল এবং ক্লিনিকের মাধ্যমে বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণের জন্য জেনেরিক ওষুধ ক্রয়ের বিষয়ে বাল্ক ওষুধ ক্রয়ের একটি সিস্টেম প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বর্তমান ভারতে বিভিন্ন রাজ্যের ওষুধ ক্রয়ের পরিস্থিতি ও বিভিন্ন সিস্টেম গুরুতর ঘাটতিতে ভুগছে এবং অযথা অর্থব্যয় বাড়ছে, অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটা এবং স্টক আউট হওয়ার ঘটনা ঘটছে। তবে রিপোর্টে ওষুধ কেনায় তামিলনাড়ু রাজ্যের মডেলের সাফল্য থেকে শেখার কথা উল্লেখ করেছে ইতিমধ্যেই যা কেরল, বিহার, মধ্যপ্রদেশ এবং ওড়িশার মতো অন্যান্য রাজ্যও অনুসরণ করছে। 'তামিলনাড়ু মডেল'-এর সাফল্যের ফলে বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণের জন্য সরকার জাতীয় স্তরে একটি বাল্ক আহরণ প্রক্রিয়া গ্রহণ করছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মতে, ইতিমধ্যে তামিলনাড়ু এবং রাজস্থানে বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করা হয়। ন্যাশনাল রুরাল হেলথ মিশন (NRHM)-এর অধীনে গর্ভবতী মহিলাদের বিনামূল্যে ওষুধ প্রদান করা হচ্ছে। কিন্তু কি এই 'তামিলনাড়ু মডেল'?

**'তামিলনাড়ু মডেল'**

'তামিলনাড়ু মহেল'-এ সমস্ত ওষুধ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ এমনকি অস্ত্রোপচার এবং সেলাই-এর সরঞ্জাম বিতরণ সরকারি হাসপাতাল এবং পাবলিক হেলথ সেন্টার (PHCs)-এর মাধ্যমে ভালো ভাবে করার জন্য একটি সরকার পরিচালিত সংস্থা তৈরি করা হয়েছে। ওষুধ বিতরণের জন্য তামিলনাড়ুতে ১৯৯৪ থেকে তামিলনাড়ু রাজ্য মেডিকেল সার্ভিসেস কর্পোরেশন (টিএনএমএসসি) নামে একটি সংস্থা গঠন করা হয়েছে। টিএনএমএসসি খুব স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এবং আবশ্যিক তালিকা অনুযায়ী ২৬৮ ড্রাগ নির্মাতারদের কাছ থেকে সরাসরি বাল্ক ক্রয় করে। এই তালিকাটি আবশ্যিক ড্রাগস তালিকার উপর ভিত্তি করে গঠন করা হয় এবং কিছু সময় অন্তর সময়োপযোগী করা হয়। এই সব ওষুধে একটি বিশেষ লোগো 'TG' (তামিলনাড়ু সরকার) লাগানো থাকে যাতে হাসপাতালের ডিস্পেনসারির বাইরে অননুমোদিত ভাবে বিক্রি করা সম্ভব না হয়। আহৃত ড্রাগ প্রতিটি জেলার টিএনএমএসসি গুদামে সংরক্ষণ করা হয় সেখান থেকে তারা সরকারি হাসপাতাল এবং পাবলিক হেলথ সেন্টারের মাধ্যমে তা বিতরণ করে। প্রতিটি সরকারি হাসপাতাল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে একটি পাসবই দেওয়া হয় যা দেখিয়ে তারা কাছের গুদামে যোগাযোগ করে ওষুধটি সংগ্রহ করতে পারেন। হাতচিঠা বা পাসবই একটি নতুন ব্যবস্থা যা কারচুপি প্রতিরোধ করতে সহায়তা করে। প্রতিটি হাসপাতালে বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য বাজেট বরাদ্দকরণের ভিত্তিতে পাসবইটি ইস্যু করা হয়। বরাদ্দ বাজেটের ৯০ শতাংশ পরিমাণ একটি বিশেষ অ্যাকাউন্টে জমা থাকে। একটি হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে তৈরি করা ইন্ডেন্ট অনুযায়ী প্রতিটি ওষুধ ক্রয় করার সময় টিএনএমএসসি এই অর্থ ব্যয় করে। এই বাজেট বরাদ্দকরণের ১০ শতাংশ হাসপাতাল এবং পাবলিক হেলথ সেন্টারগুলিকে নিজ নিজ স্থানীয় ক্রয়ের জন্য প্রদান করা হয়।

টিএনএমএসসি আহরণ ব্যয় যথেষ্ট কমানোর ক্ষেত্রে খুব সফল। এছাড়াও নিশ্চিত কঠোর আহরণ প্রক্রিয়ার ফলে ও মান নিয়ন্ত্রণ মেকানিজমের মাধ্যমে যে উচ্চ মানের ওষুধপত্র রোগীদের কাছে সরকার হাসপাতাল এবং পাবলিক হেলথ সেন্টারের মাধ্যমে বিনামূল্যে দেওয়া সম্ভব হয়েছে তা খুব সফল। বিশ্ব ব্যাংকের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, টিএনএমএসসি সিস্টেম সরকারি হাসপাতাল এবং পাবলিক হেলথ সেন্টারগুলিতে ব্যবহার করায় রোগীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়িয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে।

যদিও ভারতে একটি স্কিমের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় আহরণ এবং জেনেরিক ওষুধ বিনামূল্যে বিতরণের প্রস্তাব প্রকৃতপক্ষে ওষুধের সর্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার দিকে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। তবে অন্যান্য অনেক কারণ আছে যার জন্য মানুষ ওষুধের নাগাল থেকে বঞ্চিত। প্রয়োজন তারও সুরাহা করা যাতে এই প্রস্তাবিত স্কিম থেকে দেশবাসী সর্বোচ্চ উপকার পায়। উচ্চ পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ গ্রুপ নিজেই তার রিপোর্টে এই বিষয়ে উল্লেখ করেছে। জেনেরিক ওষুধ আহরণের একটি টেক সই উৎস বজায় রাখা প্রয়োজন ও তা নিশ্চিত করা উচিত। এটা ভারতীয় জেনেরিক ওষুধ শিল্পের বেঁচে থাকা এবং বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সরকারকে একটি নির্মোহ দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাস্থ্য বিষয়কে দেখতে ও উপযুক্ত নীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে যাতে জেনেরিক ওষুধ শিল্পকে সমর্থন করা ও ধরে রাখা যায়।

একমাত্র ভারত সরকারই পারে ওষুধের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে এসে ওষুধের প্রাপ্যতা বাড়াতে। যেখানে অধিকাংশ মানুষকে পকেট থেকে খরচ করে ওষুধ কিনতে হয় সেখানে ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণের একটি কার্যকর ব্যবস্থা অত্যন্ত প্রয়োজন। নচেৎ ওষুধ সাধারণ

মানুষের নাগালের আরও বাইরে চলে যাবে। কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত আরও শক্তিশালী ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণ নীতি ঠিক করা এবং ওষুধ ব্যাবসার বিপুল লাভের লাগাম টেনে সাধারণের আয়ত্তে ওষুধকে নিয়ে আসা।

এবার আসা যাক পশ্চিমবঙ্গের কথায়। এই রাজ্যের ক্ষেত্রে বলা যায় যে, যদি এটা কেরল, বিহার, মধ্যপ্রদেশ বা ওড়িশার মতো রাজ্য তামিলনাড়ু মডেল অনুসরণ করতে পারে, এ-রাজ্যে পারবে না কেন? পশ্চিমবঙ্গে যদি বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া নাও যায়, সস্তা জেনেরিক ওষুধ কম মূল্যে হাসপাতাল কিংবা সরকারি দোকান থেকে কেন দেওয়া যাবে না? এর জন্য কোনো ভর্তুকির প্রয়োজন নেই কারণ জেনেরিক ওষুধ অপরিমেয় লাভজনক, খুব সহজেই সরবরাহ করা যায় এবং এই সব দোকান চালানোর প্রয়োজনীয় মূলধন উৎপন্ন করতে সক্ষম। সুতরাং সাধারণ রোগী যারা উচ্চ মূল্যে ব্র্যান্ডেড ওষুধ ক্রয়ের অক্ষমতার কারণে সঠিক চিকিৎসার থেকে বঞ্চিত হয় তাদের স্বস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে তহবিলের অভাব কখনওই বাধা হওয়ার কথা নয়। বর্তমানে রাজ্য সরকার কিছু হাসপাতালে ন্যায্য মূল্যে ওষুধের দোকান ব্যক্তি মালিকানায় (Private-Public-Pertnership) চালু করেছে। এর ভ্রান্ত নীতির জন্য বাজারে সাধারণ দোকানের ব্র্যান্ডেড ওষুধের দাম বেশি পড়ছে। এতে সাধারণ মানুষ আরও প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সরকারের উচিত এদিকে দৃষ্টি দেওয়া।

**পশ্চিমবঙ্গ : ন্যায্য ও সস্তা ওষুধ আর কত দূর?**

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সমস্ত মেডিক্যাল কলেজ ও জেলা হাসপাতালে পিপিপি মডেলে 'ন্যায্য মূল্যের দোকান' নামে ওষুধ বিক্রির কেন্দ্র খুলবে যাতে সাধারণ মানুষ সস্তায় ওষুধ পায়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী গত ১১ ডিসেম্বর, ২০১২-য় কলকাতার বেশ কিছু হাসাপাতালে ওষুধের দোকান খোলা হয়েছে। এটা রাজ্য সরকারের কোনো মৌলিক সিদ্ধান্ত নয় বরং কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক কর্মসূচির অঙ্গ। কেন্দ্রীয় সরকার দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে (২০১১-২০১৬) ঠিক করেছে দেশের সকলের জন্য বিনামূল্যে ওষুধের সরবরাহ করবে। এই কর্মসূচির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ৮৫ শতাংশ দেবে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার দেবে বাকি মাত্র ১৫ শতাংশ। এ বছর এই বাবদ বাজেটে বরাদ্দ হয়েছে ৩০ কোটি টাকা। এছাড়া আরও অনেক পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে যাতে গরিব মানুষ ওষুধ পায়। রাজ্য সরকারের এক ঘোষণায় একথা বলা হয়েছে : 'This is conformity with the Vision Document 2011-15,an action plan for the DoHFW for five years, which inter alia pledges to make available quality medicines and medical consumables at affordable cost for the benefit of the patients.'

ঘোষণায় আরও বলা হয়েছে যে এই সব দোকান থেকে মানুষ ন্যায্য মূল্যে বাজারের থেকে সস্তায় ওষুধ পাবে। সরকারের পলিসিতে বলা হয়েছে, 'The PSP (Private Sector Partner) will offer maximum discounts to the customers over MRP of all items. The discounts offered will have to be more than 30% of all items to be sold to the patients through the fair price outlet.' ! কিন্তু বাস্তবে কি হচ্ছে?

প্রকৃতপক্ষে রোগীরা ৩০ থেকে ৬০ শতাংশ ছাড় পাচ্ছেন। আগেই বলেছি ভারতে বেশির ভাগ ওষুধ নিয়ন্ত্রণ আইনের (DPCO) বাইরে। ফলে বহু কোম্পানি জেনেরিক ওষুধেরও খুব বেশি দাম রাখে। এই দামে দোকানদারদের কেনা দামের ৫০০ থেকে ১০০০ শতাংশ পর্যন্ত হয়। কাজেই একই ওষুধ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দামে পাওয়া যাচ্ছে এবং দামও বাজারের থেকে বেশি। কারণ দোকানদাররা লাভের আশায় বেশি দামী ওষুধ রাখছে। তবে স্বাস্থ্য দপ্তরের বিশেষ সচিবের মতে 'ফেয়ার প্রাইস মেডিসিন সপে' জেনেরিক ওষুধে ৪৮ থেকে ৬৭ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় পাওয়া যাচ্ছে। যদি একথা সত্যিও হয়, তাও বলা যায় ওষুধ কেনা ও বেচায় সরকারি নিয়ন্ত্রণ সঠিক হলে আরও সস্তায় ওষুধ পাওয়া সম্ভব। তাছাড়া এখনও পর্যন্ত মাত্র ৬টি দোকান হয়েছে যা প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য। জেনেরিক ওষুধ যে ডিস্ট্রিবিউটরদের কাছ থেকে রিটেলাররা কত সস্তায় পায় এবং সরকার যে একটু সচেতন হলেই মানুষ এই প্রবঞ্চনার হাত থেকে মুক্তি পেত তা অনস্বীকার্য। তবে আশার কথা একটা যে, জেনেরিক ওষুধের রিটেলার ও ডিস্ট্রিবিউটরের মধ্যেকার দামের এই ফারকের কথা কিছুটা ফাঁস হয়ে যাওয়ার বিসিডিএ (বেঙ্গল ড্রাগিস্ট অ্যান্ড কেমিস্ট অ্যাসোসিয়েশন) সিদ্ধান্ত নিয়েছে, 'ফেয়ার প্রাইস মেডিসিন সপে' যে সব ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে সেগুলি তারা রাজ্যের ২৫ হাজার ফার্মেসি থেকে ২০ থেকে ৭০ শতাংশ কম দামে বেচবে।

একমাত্র সরকারি মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং সরকারি উদ্যোগই জেনেরিক ও সস্তা ব্র্যান্ডের ওষুধ সুলভে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারে এবং একই সঙ্গে একটি Standard treatment guideline তৈরি করে এবং তা যথাযথ ভাবে প্রচার করে ডাক্তারদের জেনেরিক ও সস্তা ব্র্যান্ডের ওষুধ লেখায় উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে।

**যতদিন তা না হচ্ছে আমরা কি করতে পারি**

ডাক্তার যে ওষুধটি লিখছেন আপনি তার জেনেরিক নাম পাশে লিখে দিতে বলুন অর্থাৎ তিনি যদি উচ্চ রক্তচাপ কমাতে Stamlo 5mg বা Amlopress 5mg লেখেন, তাহলে তার পাশে লিখে দেবেন Amlodepin 5mg। আপনি এবার ওষুধের দোকানে গিয়ে জেনে নিন ওই জেনেরিকের সস্তা ব্র্যান্ড কি আছে। তারপর নিয়ে নিন আপনার সুবিধার সস্তা ব্র্যান্ডটি। যদি ডাক্তার, দোকানদার কারুর সহযোগিতা না পান দোকান থেকে ডাক্তারবাবুর লেখা ওষুধটির একটি পাতা নিয়ে তার composition দেখে নিন এবং তার সস্তা প্রতিরূপটি আগের মতো খুঁজে নিন। এক দোকানদার সাহায্য না করলেও অন্য দোকানদার তার খরিদ্দার ধরে রাখার স্বার্থে সাহায্য করবে। ভারতে Drug and Cosmetic Rules অনুসারে সমস্ত ওষুধ কোম্পানিকেই GMP Certificate holder হতে হয় এবং ওষুধ তৈরির নির্দিষ্ট standard মেনেই ওষুধ তৈরি ও বিক্রির লাইসেন্স পেতে হয়। ফলে ছোটো, বড়ো সব কোম্পানির দামী, কম দামী সমস্ত ওষুধের কার্যকারিতা এক। টনিক, হজমের ওষুধ, কাশির সিরাপ ইত্যাদির ক্ষেত্রে ছাড়পত্রের ব্যাপারে (licensing) অনেক শিথিল তবে এসবই অপ্রয়োজনীয় ওষুধ তাই খাওয়ার কোনো প্রয়োজনই পড়ে না।

যারা দীর্ঘদিন ধরে একই ওষুধ খাচ্ছেন (যেমন ডায়বেটিস, হাই ব্লাড প্রেসার, নার্ভের বা মানসিক অসুখের ক্ষেত্রে) তাদের কাছে এই ধরণের ব্যবস্থা অনেকটাই সাহায্য করবে। ওষুধের বিকল্প সস্তা ব্র্যান্ড খুঁজে নিলে ডাক্তারি দিক থেকে কোনো ক্ষতি নেই এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় আর এতে পকেট বাঁচে। এখন নিজের বা পরিবারের লোকজনের চিকিৎসা চালিয়ে নিয়ে যেতে এইটুকু সাহস আপনাকে দেখাতে হবে—নিজের অকারণ অর্থিক ক্ষতি রোধের স্বার্থেই। □

# ব্যথা যখন কোমরে

পুণ্যব্রত গুণ

ছত্তীসগঢ়ে কাজ করার সময় কোমরের ব্যথায় ভুগতে দেখতাম লোহা খনির পরিবহণ শ্রমিকদের মধ্যে। ঝুঁকে লোহা পাথর ভর্তি ঝুড়ি তুলতে গিয়ে তাঁদের কোমরে হঠাৎ করে তীব্র ব্যথা দেখা দিত— ডাক্তারি পরিভাষায় এ রোগের নাম প্রোলাপ্সড ইন্ট্রাভার্টিব্রাল ডিস্ক বা স্লিপড ডিস্ক। এখন যেখানে কাজ করি সেখানকার প্রধান অসংগঠিত শিল্প জরি শিল্প। এ শিল্পে দিনে ১৪-১৬ ঘণ্টা এক ভাবে বসে কাজ করতে হয়। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে জরি শ্রমিকরা আরেক ধরণের কোমর ব্যথায় ভোগেন— যার নাম মেকানিকাল বা যান্ত্রিক কোমর ব্যথা। এ ছাড়া দুর্ঘটনায় বা পড়ে গিয়ে কোমরে লেগে ব্যথা তো আছেই।

কোমরে ব্যথা বা low back pain সারা পৃথিবীরই এক গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সমস্যা। শিল্পোন্নত দেশগুলোতে ব্যথার অসুখে মাথা ব্যথার পরেই কোমর ব্যথার স্থান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক তথ্যে দেখা যায়— এইডস, ক্যান্সার ও মস্তিষ্কের স্ট্রোক মিলিয়ে যত কাজের দিন নষ্ট হয়, তার চেয়েও বেশি দিন নষ্ট হয় কোমর ব্যথায়।

**কোমরের গঠন**

বিষয়ে ঢোকার আগে মেরুদণ্ডের গঠন সম্পর্কে কিছু জেনে নিলে সুবিধা হবে। মানুষ মেরুদণ্ডী প্রাণী, অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণী থেকে মানুষের বড়ো পার্থক্য হলো, সে দু'পায়ে হাঁযে। দু'পায়ে হাঁটার জন্য তাকে যে মাসুলগুলো দিতে হয়, তার মধ্যে অন্যতম কোমর ব্যথা।

ভ্রূণ যখন মায়ের পেটে থাকে, তখন হাত-পা গুটিয়ে কুঁকড়ে থাকে সামনের দিকে, তার মেরুদণ্ড থাকে ধনুকের মতো পিছন দিকে বাঁকা। জন্মের মোটামুটি ৬ মাস পরে বাচ্চা যখন মাথা তুলতে শেখে, তখন মেরুদণ্ডে গলার কাছটায় একটা বক্রতা তৈরি হয়, যার উত্তল দিকটা সামনের দিকে। যখন সে দু'পায়ে দাঁড়াতে শেখে, তখন তার কোমরের অঞ্চলে আরেকটা অগ্রবক্রতা তৈরি হয়। সুষুম্না-কাণ্ডকে রক্ষা করা ছাড়া মেরুদণ্ডের আরেকটা বড়ো কাজ হলো শরীরের ওজনকে বহন করা। দাঁড়ানো অবস্থায় শরীরের ওজন মেরুদণ্ড বেয়ে কোমরের নীচের হাড় শ্রোণিচক্র (পেলভিস) ও শ্রোণিচক্র থেকে দুই পা বেয়ে জমিতে চলে আসে।

কোমরে ব্যথার জন্য দায়ী হলো মেরুদণ্ডের সামনে-পেছনে, ডাইনে-বাঁয়ে বাঁকার ক্ষমতা। ঘাড় ও কোমরে মেরুদণ্ড সবচেয়ে সচল। মোট ৩৩টা ছোটো ছোটো হাড় (কশেরুকা) পুঁতির মালার মতো একটার ওপর একটা বসিয়ে তৈরি মানুষের মেরুদণ্ড— ঘাড়ে ৭টা, বুক-পিঠে ১২টা, কোমরে ৫টা, তার নীচে ৫টা একসঙ্গে জোড়া হাড়, তারও নীচে ৪টা একসঙ্গে জোড়া হাড়। জটিলতা এড়াতে নামগুলো মনে রাখার দরকার নেই।

যে সব কশেরুকা নড়াচড়া করতে পারে তারা পরস্পরের সঙ্গে কয়েক ধরণের জোড় বা অস্থিসন্ধি এবং বন্ধনী বা লিগামেন্ট দিয়ে যুক্ত।

মেরুদণ্ডের একেকটা হাড় অর্থাৎ কাশেরুকা দেখতে যেন পাথর-বসানো আংটির মতো। মাঝখানের ফুটোটা দিয়ে সুষুম্নাকাণ্ড নামে ফুটোর সামনের অংশকে কশেরুকা কাণ্ড বলে, পেছনের অংশকে কশেরুকা খিলান বলে।

দুটো কশেরুকা কাণ্ডের মধ্যে থাকে একটা করে মেরু চাকতি (intervertebral disc)। উপাস্থি বা কার্টিলেজ দিয়ে তৈরি এই চাকতিগুলোর বাইরের দিকটা রবারের মতো নরম আর চাকতির ভেতরের অংশটা জেলির মতো— যাকে বলে চাকতি মজ্জা। চাকতি মজ্জাকে ঘিরে থাকে একটা শক্ত আবরণী, যা পর পর দুটো কশেরুকা কাণ্ডকে ধরে রাখে। দুটো কশেরুকার মধ্যে থাকা এই নরম গদির মতো মেরু চাকতির জন্য আমরা মেরুদণ্ডকে সামনে-পেছনে, ডাইনে-বাঁয়ে বাঁকাতে পারি।

সামনে ঝুঁকে কোনো ভারী জিনিস তোলার সময় অনেক ক্ষেত্রে মেরু চাকতির আবরণী ফেটে গিয়ে চাকতি মজ্জা মেরু নালী বা মেরু ছিদ্রে ঢুকে যেতে পারে। মেরু নালীতে সুষুম্নাকাণ্ড ও তা থেকে বের হওয়া স্নায়ুর গোড়াগুলো থাকে। সেগুলোর ওপর বেরিয়ে আসা চাকতি মজ্জা চাপ দিলে কোমর থেকে পায়ে ব্যথা নামে— সাধারণ কথায় এ ব্যথাকে বলা হয় সায়াটিকার ব্যথা।

**কোমরে ব্যথার কারণ**

কোমরে ব্যথার কারণকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়।

১. জন্মগত কারণ : কশেরুকার দু'দিকের খিলানের মধ্যে ফাঁক থাকা (spina bifida), কশেরুকার কাণ্ডের অর্ধেকটা তৈরি না হওয়া (hemivertebra), কোমরের কশেরুকা কোমরের নীচে ৫টা জোড়া কশেরুকার মতো হওয়া (sacralisation of lumber vertebra), কোমরের নীচের ৫টা জোড়া কশেরুকা কোমরের কশেরুকার মতো হওয়া (lumbarisation of sacral vertebra)।

এছাড়াও আরও দুটো কোমর ব্যথার গুরুত্বপূর্ণ কারণকে অনেকে জন্মগত কারণ বলে মনে করেন---খিলান বিকার (spondylolysis) ও কশেরুকা ভ্রংশ (spondylolisthesis)।

২. আঘাতজনিত কারণ : কোমরের পেশীর আঘাত ও মেরুদণ্ডের আঘাত—কশেরুকা ভঙ্গ (fracture) বা কশেরুকা চ্যুতি (dislocation)।

৩. প্রদাহজনিত কারণ : কশেরুকার যক্ষ্মারোগ (caries spine বা TB spine), পুঁজসৃষ্টিকারী মেনিনজাইটিস (pyogenic meningitis), যক্ষ্মাজনিত মেনিনজাইটিস ((TB meningitis), রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস,আংকাইলোজিং স্পন্ডিলাইটিস।

৪. টিউমারজনিত কারণ : কশেরুকার বিভিন্ন টিউমার, স্নায়ুমূলের টিউমার, সুষুম্নাকাণ্ডের আবরণীর টিউমার থেকেও কোমর ব্যথা হতে পারে। কোন্ টিউমার নিরাপদ (benign), কোন্‌টা মারাত্মক (malignant)। এছাড়া শরীরের অন্য জায়গার ক্যান্সার কোষও রক্তস্রোতে ভেসে এসে মেরুদণ্ডে জমাট বাঁধতে পারে। ক্যান্সার ছাড়াও অনেক ধরণের মারাত্মক রোগের বাসা বাঁধার প্রিয় জায়গা মেরুদণ্ড, এমনই একটা রোগ মাল্টিপল মায়েলোমা। এসব রোগেও কোমরে ব্যথা হয়।

৫. বুড়িয়ে যাওয়া : মেরুদণ্ডের বিভিন্ন অংশ অকালে বুড়িয়ে গেলেও কোমর ব্যথা হতে পারে।

কোমর ছাড়া অন্য অঙ্গের রোগেও কোমর ব্যথা হতে পারে, যেমন—আমাশা, সাদা স্রাব, কোষ্ঠবদ্ধতা, প্রস্রাবে জীবাণু সংক্রমণ, মানসিক উদ্বেগ ইত্যাদি।

### এঁরা কোমর ব্যথায় বেশি ভোগেন

১. বয়স — ৫৫ বছর বয়স অবধি কোমর ব্যথার সম্ভাবনা বাড়তে থাকে।

২. লিঙ্গ— ৬০ বছর বয়স অবধি কোমর ব্যথার সম্ভাবনা নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে সমান। তার পর থেকে মহিলাদের কোমর ব্যথার সম্ভাবনা বাড়তে থাকে।

৩. শরীরের মাপজোক— মোটা মানুষদের ও লম্বা মানুষদের কোমর ব্যথা হওয়ার সম্ভাবনা একটু বেশি।

৪. শরীরর স্থিতি (Posture)—শোয়া, বসা, দাঁড়ানো, ইত্যাদি ঠিকঠাক না হলে কোমর ব্যথা বেশি হয়।

৫. মাংসপেশীর জোর—পেট ও পিঠের মাংস-পেশী কমজোর হলে কোমর ব্যথার সম্ভাবনা বাড়ে।

৬. সন্তান জন্ম—বারবার প্রসব হলে বা সিজারিয়ান অপারেশন করে প্রসব হলে কোমর ব্যথার সম্ভাবনা বাড়ে।

৭. পেশা—যাঁদের কঠোর ও ভারী কাজ করতে হয়, ভারী ওজন তুলতে হয়, কোনো কিছু টানতে, ঠেলতে বা মোচড়াতে হয়, যাঁদের অনেকক্ষণ বসে বা হাঁটু মুড়ে থাকতে হয়, যাঁদের নিজের পেশা একঘেঁয়ে বলে মনে হয়, তাঁদের কোমর ব্যথা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

### রোগ নির্ণয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা

১. এক্স-রে হল কোমরে ব্যথায় সবচেয়ে বেশি করা পরীক্ষা। কিন্তু এক্স-রে-তে হাড় ছাড়া অন্য কিছু দেখা যায় না, তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগের কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। কোমরের এক্স-রে করার আগের রাতে হাল্কা জোলাপ খেয়ে পর দিন পায়খানা করার পর একদম খালি পেটে এক্স-রে করলে এক্স-রে স্পষ্ট হয়। ২. রক্তের নানা পরীক্ষায় রোগ-নির্ণয়ের নানা সূত্র পাওয়া যেতে পারে। ৩. আগে সিটি স্ক্যান, এখন এমআরআই স্ক্যান কোমরের নানা রোগ-নির্ণয়ে সাহায্য করে, তবে দুটো পরীক্ষাই খরচ-সাপেক্ষ। ৪ সিটি স্ক্যান, এমআরআই স্ক্যান চালু হওয়ার অগে মায়েলোগ্রাফি নামে এক বিশেষ এক্স-রে পরীক্ষা করা হতো অনেক ক্ষেত্রে। ৫. কিছু ক্ষেত্রে CSF বা মস্তিষ্ক-মেরুরস পরীক্ষাতেও রোগ ধরা পড়ে।

### নানা রোগে নানা চিকিৎসা

১. যান্ত্রিক কারণে কোমর ব্যথা হলে কাজ করা ও স্থির থাকার সময় যে সব ভুল অবস্থান কোমরে ব্যথার কারণ সেগুলোকে শুধরাতে হয়। এছাড়া পিঠ ও পেটের মাংসপেশীগুলোকে মজবুত করার জন্য ব্যায়াম করতে হয়। ২. Lumbar spondylosis-এ কশেরুকার জোড়গুলোকে যে সব মাংসপেশী ধরে রাখে সেগুলোকে মজবুত করার ব্যায়াম করতে হয়। ৩. চাকতি সরে যাওয়া (slipped disc)-এ ব্যথা কমা অবধি একদম শুয়ে বিশ্রাম নিতে হয়, বসাও বারণ, কেননা তাতে কোমরে চাপ পড়ে সবচেয়ে বেশি। আল্ট্রাসাউন্ড চিকিৎসা ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। ব্যথা কমার পর ব্যায়াম শুরু করতে হয়। ৪. খিলান বিকার (lumber spondylolysis) ও কশেরুকা-ভ্রংশ (lumbar spondylolisthesis)-এ কাজ করার সময় বেল্ট ব্যবহার করতে হয়। মেরুদণ্ডের প্রতিনমন ব্যায়াম (spinal extension exercise) অর্থাৎ উপুড় হয়ে ব্যায়াম করা বারণ। মেরুদণ্ডের আনমন ব্যায়াম (spinal flexion exercise) অর্থাৎ চিৎ হয়ে করা ব্যায়াম এবং পেটের মাংসপেশী মজবুত করার ব্যায়াম (abdominal muscle strengthening exercise) করতে হয়।

### কোমর ব্যথায় অপারেশন

কোমর ব্যথার রোগীদের ২৫০০ জনের মধ্যে অপারেশন লাগে মাত্র ১ জনের। মেরু চাকতি সরে যাওয়ার রোগীদের, মেরুনালী সংকোচনের রোগীদের কখনও কখনও অপারেশন করা হয়। তবে অপারেশন করার পর অনেকেরই কষ্ট আরও বেড়ে যায়। এখন ব্যথা কমানোর নানা আধুনিক পদ্ধতি আবিষ্কার হওয়ার পর অপারেশনের প্রয়োজনীয়তা অনেক কমে গেছে।

### কোমর ব্যথা প্রতিরোধে ব্যাক স্কুল

যে সব পেশায় কোমর ব্যথা হওয়ার ঝুঁকি বেশি সেখানে প্রতিরোধের এক অভিনব উপায় ব্যাক স্কুল। এখানে শেখানো হয়: ১. কোমরের গঠন ও কাজ করার পদ্ধতি, বয়স হলে মেরুদণ্ডে কি কি পরিবর্তন হয়। ২. শরীরকে ঠিকঠাক চালানোর পদ্ধতি ও কোমরে আঘাতের প্রাথমিক চিকিৎসা। ৩. মনোচিকিৎসা, শরীরকে চাপমুক্ত ও মনকে উদ্বেগহীন রাখার উপায়। ৪. যাঁদের কোমরে ব্যথার ইতিহাস আছে তাঁদের জন্য ব্যায়াম। সুইডেন, আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া, কানাডা ও ভারতের কোয়েম্বাটোরে এরকম ব্যাক স্কুল চালিয়ে ফল পাওয়া গেছে। পশ্চিমবঙ্গে এখনও এরকম উদ্যোগ শুরু করা যায়নি।

### আরও কিছু জানার কথা

১. ৯০ শতাংশ কোমর ব্যথা কোনো ডাক্তারি সাহায্য ছাড়াই ৬ থেকে ১২ সপ্তাহের মধ্যে ভালো হয়ে যায়। ৫০ শতাংশ তো ১ সপ্তাহের মধ্যেই সেরে ওঠেন। ২. হঠাৎ করে হওয়া কোমর ব্যথায় ২-৩ দিনের বেশি বিছানায় শুয়ে থেকে লাভ নেই। ৪ দিনের বেশি বিছানায় শুয়ে থাকলে স্বাভাবিক কাজে ফিরতে অসুবিধা হয়। ৩. হঠাৎ করে হওয়া কোমর ব্যথায় প্রথম পছন্দের ওষুধ প্যারাসিটামল। ৯০ শতাংশের এতেই কাজ হয়। ৪ কোমর ব্যথা প্রদাহজনিত কারণ না হলে আইবুপ্রোফেন বা ডাইক্লোফেনাক-এর মতো প্রদাহরোধী ওষুধে লাভ নেই। আফিমজাত বেদনানাশক কোডিন, ডেক্সট্রোপ্রোক্সিফেন, ইত্যাদি ভালো কাজ করে এমন প্রমাণ নেই। ৫ মাংসপেশীর খিঁচ কমানোর ওষুধ, অ্যান্টিহিস্টামিনিক ইত্যাদিকে প্রদাহরোধী ওষুধে মেশালে কার্যকারিতা বাড়ে এমন নয়। ৬. হঠাৎ করে হওয়া কোমর ব্যথায় বেল্ট ব্যবহার করলে লাভ হয় না। ৭. কোমরে গরম বা ঠাণ্ডা সেঁক দিলে তেমন লাভ নেই, ক্ষতিও নেই। ৮ হঠাৎ করে হওয়া কোমর ব্যথায় ডায়াথার্মি, মালিশ, আল্ট্রাসাউন্ড চিকিৎসা, চামড়ায় লেজার বা বৈদ্যুতিক উত্তেজনা, ট্র্যাকশন (টান) দেওয়া ইত্যাদিতে তেমন ফল পাওয়া যায় না।□

## বাচ্চাদের জন্যে ঘি একটি পুষ্টিকর খাবার

একটি দীর্ঘমেয়াদী সমীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী ভারতের ১৯.২ শতাংশ পুরুষ এবং ১৮.১ শতাংশ মহিলা স্থূলতার শিকার, এবং প্রায় ৬৪.৮ শতাংশ মায়েরা একই পরিস্থিতির সম্মুখীন।

সরকারি এবং বেসরকারি স্কুলে ৭ থেকে ১৮ বছর বয়সের ১৮০০ পড়ুয়াদের মধ্যে এই সমীক্ষা চালানো হয়। *Annals of Nutrition and Metabolism* নামের একটি আন্তর্জাতিক পত্রিকায় এই সমীক্ষার ফলাফলটি প্রকাশিত হয়। ডায়াবেটিকস ফাউন্ডেশান অফ ইন্ডিয়া দিল্লী, আগ্রা, ব্যাঙ্গালোর এবং পুণে— ভারতের এই চারটি শহরে সমীক্ষাটি চালান।

সমীক্ষায় দেখা গেছে, মায়েদের মধ্যে পুষ্টি বিষয়ে ধারণার অভাব আছে। ফাস্টফুডের প্রতি আসক্তি এবং ব্যায়াম করার অনভ্যাস বাচ্চা এবং তাদের মায়েদের মধ্যে স্থূলতার মূল কারণ। মায়েরা অনেকেই মনে করেন যে, বাচ্চাদের এই স্থূলতা আসলে 'বেবি ফ্যাট' যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পায়। আবার অনেকে মনে করেন, সব খাবারই স্বাস্থ্যকর যদি তা সঠিক উপায়ে রান্না করা যায়। আরও ভয়ানক অবস্থা হলো,বাজার চলতি সাদা তেল, ঘি, মাখন ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা। যথাক্রমে ৮৯.২ শতাংশ, ৭৯.২ শতাংশ এবং ৫৫.১ শতাংশ মায়েরাই বিশ্বাস করেন যে, বাজার চলতি সাদা তেল, ঘি, মাখন ইত্যাদি স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক নয়। প্রায় ৮২.৫ শতাংশ মায়েরা তাদের প্রতিদিনের খাবারে ঘি এবং ৪৬.৫ শতাংশ মায়েরা তাদের খাবারে মাখনের ব্যবহার করে থাকেন। ফলস্বরূপ, ভারতের প্রায় দেড় কোটি ছেলেমেয়ে স্থূলতার শিকার। এই সমস্যা সমাধানের উপায় হিসাবে গবেষকরা মনে করছেন যে, ফাস্টফুড তাদের বাচ্চাদের ওপর কি ধরণের প্রভাব ফেলতে পারে তা নিয়ে মায়েদের ওয়াকিবহাল হওয়া উচিত। কারণস্বরূপ দেখা গেছে যে, ৭২.৩ শতাংশ কমবয়সী ছেলেমেয়ে এবং ৮৩.৫ শতাংশ বড়ো বয়সী ছেলেমেয়েরা দিনে প্রায় দু বারের বেশি ফাস্টফুড খেতে অভ্যস্ত এবং প্রায় ৬৩.৮ শতাংশ মায়েদের এই অবস্থা নিয়ে কোনো অভিযোগ নেই। আর তার ফল হিসাবে দেখা যাচ্ছে আইসক্রিমের রমরমা।

ডায়াবেটিকস ফাউন্ডেশান অফ ইন্ডিয়া-র অধিকর্তা ড. অনুপ মিশ্রর মতে : 'এই ধরনের সমীক্ষা আগে কখনও এত বিশদ ভাবে করা হয়নি, যেখানে দেখানো সম্ভব হয়েছে যে মায়েদের নিজস্ব ধারণা, তাদের ভাবনা চিন্তা এবং অভ্যেস তাদের সন্তানদের খাদ্যাভ্যাসকে প্রভাবিত করে।

সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রায় ৭১.৭ শতাংশ বেশি বয়সের ছেলেমেয়েরা বাড়ির পরিবর্তে ক্যান্টিনে খাওয়া পছন্দ করে এবং ৫০.৬ শতাংশ ছেলেমেয়েদের কাছে বাড়ির খাবার একঘেয়ে। ২৪ শতাংশ মায়েরাও বাড়ির খাবারের পরিবর্তে বাইরের খাবার পছন্দ করেন এবং ১৫ দিনে অন্তত একবার তারা বাইরের ফাস্টফুড খান। আরও দেখা গেছে, হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস এবং হৃদরোগ নিয়ে বাচ্চারা এবং তাদের মায়েরা যতটা সচেতন ঠিক ততটাই সচেতনতার অভাব ট্রাইগ্লিসারাইডস সম্পর্কে।

ডায়াবেটিকস ফাউন্ডেশান অফ ইন্ডিয়া এর মুখ্য প্রকল্প অধিকর্তা ড. সীমা গুলাটির মতে মায়েদের মধ্যে এই ট্রাইগ্লিসারাইডস এবং ক্যান্সার নিয়ে অজ্ঞানতার হার যথাক্রমে ৮১.৬ শতাংশ এবং ৬৭.৩ শতাংশ। বেশির ভাগ মায়েরাই প্যাকেট বন্দি খাবারকে স্বাস্থ্যকর এবং পুষ্টিকর বলে মনে করেন কারণ তাদের মতে এটি স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্যাকেট করা হয়। কিন্তু মায়েরা এই বিষয়ে যে কথাটি ভুলে থাকেন তা হলো যে এই ধরণের খাবারে কৃত্রিম গন্ধ, স্বাদ, মিষ্টত্ব, নুন এবং প্রিসারভেটিভের ব্যবহার যথেচ্ছ ভাবে করা হয় যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এর মধ্যে সব থেকে চিন্তার বিষয় হলো, প্রায় ৭১.৭ শতাংশ বাচ্চারা ফাস্ট ফুড খাওয়া বন্ধ করার জন্য মানসিক ভাবে প্রস্তুত নয় এবং ৪৭ শতাংশ যে কোনো রকমের শারীরিক ব্যায়াম করতে অনিচ্ছুক। আশ্চর্যজনক ভাবে অন্যান্য উন্নত দেশগুলোতে স্থূলতা যেমন নিম্নবিত্তদের মধ্যে বেশি লক্ষণীয়, ভারতের ক্ষেত্রে এই রোগের শিকার মূলত উচ্চবিত্তের (মাসে যাদের গড় আয় ৫০,০০০.০০ টাকার বেশি) ছেলেমেয়েরা। এমনকি উচ্চ শিক্ষিত বাবা মায়ের সন্তানদের মধ্যেও এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বেশি।

সূত্র : *টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া*,৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩।

সংকলক : **মধুশ্রী দাস**

## ওষুধে আসক্তি বাড়াচ্ছে ডাক্তারি প্রেসক্রিপশন

বিশ্বের কিছু বিশিষ্ট লোক যেমন হিথ লেজার, ব্রিটানি মারফি, আনা নিকোল স্মিথ, হুইটনি হাউস্টন-এর মৃত্যুর কারণ সারা বিশ্বে এখনও ব্যাপক ভাবে চর্চিত এবং আলোচ্য বিষয়ের একটি। এদের মধ্যে আবার যার ঘটনা মানুষের মনে সব থেকে বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তিনি হলেন মাইকেল জ্যাকসন। এদের প্রত্যেকের মৃত্যুর পিছনের মূল কারণ ছিল ক্ষতিকারক ওষুধের যথেচ্ছ ব্যবহার বা তার প্রতি আসক্তি।

ক্ষতিকারক ওষুধের ব্যবস্থাপত্র দেওয়ার ফলে বেশি মাত্রায় ওষুধের ব্যবহার এবং এর প্রতি আসক্তি বর্তমানে বিশ্বের সব থেকে সাড়াজাগানো বিষয়গুলির মধ্যে একটি।

নিউ ইয়র্ক শহরে প্রকাশিত একটি সমীক্ষার ফলাফলে দেখানো হয়েছে যে, বর্তমানে ক্ষতিকারক ওষুধের ব্যবহারের হার প্রেস্ক্রিপশনে এবং মানুষের জীবনে অতিরিক্ত মাত্রায় বেড়ে গিয়েছে এবং এই কারণে মৃত্যুর হার আমেরিকার কালো চামড়ার মানুষদের তুলনায় সাদা চামড়ার মানুষদের মধ্যে প্রায় তিনগুণ বেশি। এই সমীক্ষায় আরও জানা গেছে,

যে ১৯৯০ সালের পর থেকে প্রেসক্রিপশনে আফিমজাত ওষুধের ব্যবহার যেমন অক্সিকনটিন প্রায় ৭ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

*Drug and Alcohol Dependence* নামের একটি পত্রিকায় প্রকাশিত ফলাফল থেকে জানা গেছে, গত ১৬ বছরের সময়সীমার মধ্যে অনুমোদিত আফিমজাত ওষুধের ব্যবহার প্রায় ৭ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা এখনও পর্যন্ত আমেরিকার সাদা চামড়ার মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির মেলম্যান স্কুল অফ পাবলিক হেলথ-এর মতে এখনও পর্যন্ত এই সমীক্ষাটিই এ বিষয়ে সর্বপ্রথম বিশদ ও বিস্তৃত সমীক্ষা।

অনুমোদিত ওষুধগুলিকে এক্ষেত্রে দু'রকম ভাবে ভাগ করা হয়েছে। ১. Analgesics অথবা ব্যথা নিরোধক ওষুধ যেমন অক্সিকনটিন (অক্সিকোডন) এবং ২. মেথালডোন, যা হেরোইনে আসক্ত রোগীদের চিকিৎসার্থে ব্যবহার করা হয়। তবে এর একটি ক্ষতিকারক দিকও আছে। এটি ওভারডোজের সম্ভাবনা ও তার ক্ষতিকারক ফলও বহন করে। ১৯৯০-২০০৬ সালের মধ্যবর্তী সময়ের সংগৃহীত চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্যাবলী গবেষকরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, বহু মানুষের মৃত্যুর কারণ ডাক্তারের অনুমোদিত আফিম ও হেরোইন জাত ওষুধ। শহরাঞ্চলে এই ধরণের ওষুধ ব্যবহারের প্রবণতা অনেক বেশি যা এখন রীতিমতো প্রমাণিত সত্য। গবেষকরা সমীক্ষার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, ব্যাথা নিরোধক ড্রাগ যেমন অ্যানালজেসিকস-এর অতি প্রয়োগের হার প্রতি দশ হাজার জন পিছু ২.৭ জন।

তবে মেথাডোন ওষুধের ব্যবহার বর্তমানে কমছে-বাড়ছে না তবে হেরোইনের প্রয়োগ ক্রমশ কমছে। আমেরিকার কালো চামড়ার মানুষ এবং হিসপানিকসদের তুলনায় সাদা চামড়ার মানুষদের মধ্যে অ্যানালজেসিকস ব্যবহারের প্রবণতা বেশি।

সূত্র : *টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া*, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩।

সংকলক : **মধুশ্রী দাস**।

# রাজ্যের ক্ষমতা এখনও উচ্চবর্ণের হাতেও কেন্দ্রীভূত

বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদ আশিস নন্দীর জয়পুরে একটি সাহিত্যসভায় বলা বক্তব্য বিতর্কের ঝড় তুললেও তার মন্তব্যের একটি দিক কিছুতেই হেলায় উড়িয়ে দেওয়া যায়নি। গত ১০০ বছরে পশ্চিমবঙ্গে প্রশাসন বা সরকারি মহলে কোনো তফসিলি জাতি বা উপজাতি অথবা আদিবাসী বা অনুন্নত সমাজের কোনো প্রতিনিধি ক্ষমতায় আসেনি বা আসতে পারেনি।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে বিধানসভার বেশির ভাগ বিধায়ক এবং তাদের সহকর্মীরা প্রত্যেকেই সমাজের উচ্চবর্ণের প্রতিনিধি। স্বাধীনতার পরে কংগ্রেসের ও তারপরের সব মিলিজুলি সরকারের স্বল্প জমানায়, কিংবা তারপরে ২০১১ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৩৫ বছরের বাম জমানায় এমনকি বর্তমান তৃণমূল সরকারের বিধানসভাতেও সমাজের অনুন্নত, পিছিয়ে পড়া, তফসিলি জাতি বা উপজাতির প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা খুবই কম। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যেখানে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের শৈশবভূমি এবং যেখানে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬৮ শতাংশ তফসিলি জাতি, উপজাতি এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের অন্তর্গত সেখানে এইরকম অবস্থা সত্যিই হতাশাজনক।

রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ-এর সময় থেকে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রীগোষ্ঠীও শ্রীনন্দীর কথার সত্যতাই প্রমাণ করছে। আরও আশ্চর্যজনক যে, যেখানে পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার মাত্র ২ শতাংশ যেখানে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত দেখা যাচ্ছে তারাই রাজ্যের বেশির ভাগ গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারী। রাজ্যের মোট ৪৪ জন বিধায়কদের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী সহ ১৪ জনই এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত। কেবল ২ জন বিধায়ক আদিবাসী, এবং ৭ জন বিধায়ক তফসিলি জাতি এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত। তবে তারও মধ্যে আবার বেশির ভাগই কম গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত। উদাহরণস্বরূপ এখানে প্রাক্তন সিবিআই-এর যুগ্ম অধিকর্তা শ্রী উপেন বিশ্বাসের প্রসঙ্গ আনা যেতে পারে যিনি বর্তমানে অনগ্রসর শ্রেণি সমাজ কল্যাণ দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং অবশিষ্ট মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীরা প্রত্যেকেই অন্যান্য দপ্তর যেমন যুব বা জল পরিবহণের দায়িত্বে আছেন। এ রাজ্যের ফরেস্ট দপ্তরের বিধায়ক পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি।

রাজ্যের সংখ্যালঘু অর্থাৎ মুসলিম সম্প্রদায়ের (যারা মোট জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ) প্রতিনিধি কেবল ৫ জন (৪৪ জন সাংসদের মধ্যে)। গত ৩৪ বছরে বাংলার রাজনীতিতে বিধায়কদের মধ্যে এই ধারাই চলে আসছে।

সমাজতত্ত্ববিদ মধুসূদন ঘোষের মতে, সমাজের ব্রাহ্মণ এবং উচ্চবর্ণের লোকেরাই এই রাজ্যের বেশির ভাগ স্তরে গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারী। শুনতে খারাপ লাগলেও এটা সত্যি যে, রাজ্যের ক্ষমতায় যে সরকারই আসুক না কেন, এই অবস্থার পরিবর্তন কখনই করা হয়নি। যে বাংলা বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ-র জন্মভূমি সে বাংলায় অনগ্রসর, অনুন্নত তফসিলি জাতি এবং উপজাতি আজও ক্ষমতা থেকে শতহস্ত দূরে। শ্রী ঘোষ আরও জানান যে, এই পরিস্থিতি শুরু ব্রিটিশ আমল থেকে। ১৮৯২ সালে যখন প্রথম ভোট চালু করা হয় তখনও বাংলার ব্রাহ্মণ এবং উচ্চবর্ণের লোকেরাই তাতে অংশগ্রহণ করেন এবং মনোনীত হন। ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রীরা যেমন— প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, বিধানচন্দ্র রায়, প্রফুল্ল সেন, অজয় মুখার্জি এবং সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় প্রত্যেকের আমলেই মোট বিধায়কের ৭৫ শতাংশই উচ্চবর্ণের দখলে ছিল। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর আমল যেহেতু 'সবার জন্য সমান অধিকার' এই মতে বিশ্বাসী ছিল, সেই কারণে তাঁর শাসনের প্রথম বছরে উচ্চবর্ণের প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা ৭৫ শতাংশ থেকে ৬০ শতাংশে নেমে দাঁড়ায়। জ্যোতি বসুর পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের আমলে ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত এই হার অপরিবর্তিত থাকে। শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জিও এই অবস্থার এখনও পর্যন্ত কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পারেননি।

তবে বর্তমানে রাজ্যের অনগ্রসর সম্প্রদায় এইরকম অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেছে। রাজ্যের আইপিএস অফিসার, নজরুল ইসলামের মতে রাজ্যের তফসিলি জাতি, উপজাতি এবং অনগ্রসর সম্প্রদায়ের এইবার একটি রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করা দরকার। তিনি বিশ্বাস করেন তবেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজন মুসলিম, বা তফসিলি জাতি বা উপজাতির সম্প্রদায়ভুক্ত হবে।

সূত্র : *টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া*, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩।

সংকলক : **শান্তনু দাস**

# কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তায় পশ্চিমবঙ্গ এখনও পিছনের সারিতে

এই বছর ভারত Mahatma Gandhi National Rural Employment Gaurantee Act (MGNREGA) -এর ৭ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান করলেও বর্তমানে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা এবং কর্ম জোগানের দিক থেকে তার কার্যকারিতা অত্যন্ত দুর্বল। আর পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা আরও শোচনীয়।

পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেত মজুর সমিতির আনা অভিযোগ অনুযায়ী কিছু সংখ্যক ভূমি-মালিক কৃষক, শিল্পপতি এবং বুদ্ধিজীবীদের যৌথ মদতে NREGA-এর পরিকল্পনা এই রাজ্যে কার্যকর হতে পারছে না। পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেত মজুর সমিতি এই মর্মে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বামফ্রন্ট এর সমালোচনা করতে গিয়ে জানিয়েছেন যে তারা এই অবস্থার বিরুদ্ধে ১০ দিন ব্যাপী দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, নদীয়া এবং বাঁকুড়ার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেছেন। ক্ষেত মজুর সমিতির আরও অভিযোগ যে, ২০১১-১২ সালে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক পরিবারে অনুমোদিত ২৫ দিনের (জাতীয় গড়) কাজের বদলে কেবল ১৪ দিনের কাজ সুনিশ্চিত করতে পেরেছে। ২০১১-১২ মোট জনদিবস কর্মসংস্থানে ১৪৩৩.২২ কর্ম-দিবস সৃষ্টি করতে পারলেও লক্ষ্যমাত্রা ১৯০০ লক্ষ থেকে বহু বহু দূরে।

২০১২ সালে এই প্রকল্পে কর্মনিয়োগের সংখ্যা ৬৪৬.৪৬ লক্ষ কর্মদিবসে নেমে এসেছে। ২০১১-১২-য় কর্মসংস্থানে মোট জন-দিবস তৈরির লক্ষ্য ১৫৩৩.০৬ লাখ থেকে ১৪৩৩.৫৯ লাখ জন-দিবসে নেমে গেছে। এ-বছরের আর্থিক-বর্ষ শেষ হতে আর সামান্য সময় বাকি অথচ মাত্র ১২১৮.৮৪ লাখ কর্মদিবস ইতিমধ্যে সৃষ্টি করা গেছে।

ক্ষেত মজুর সমিতির মতে বামফ্রন্ট সরকার যেখানে অন্তত দিনে গড়ে ৩৬ জন লোক নিযুক্ত করতে পেরেছিল বর্তমান সরকার তার ধারেকাছেও পৌঁছুতে পারেনি। কেন্দ্রীয় সরকার ২০১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ৬১,০০০ টি পঞ্চায়েতের জন্য প্রায় ১,০৫৪ কোটি টাকা ধার্য এবং বণ্টন করেছিল। কিন্তু ১০০ দিনের কাজে লোক নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার কতদূর তার লক্ষ্য পূরণ করতে সমর্থ হবে তা নিয়ে সংশয় দেখা দেওয়ায় সেই টাকার বেশির ভাগ অংশকে কাজে লাগানো সম্ভব হয়নি। কৃষক নেতা খুশী রাম সর্দারের মতে খুব অল্পসংখ্যক পরিবারকেই এখনও অবধি ১০০ দিনের কাজে নিযুক্ত করা গেছে। ২০১২-১৩ সালে এই সংখ্যা মাত্র ৭০,৯৭৬ যা মোট সংখ্যার ১.৫ শতাংশ। তাঁর বক্তব্য, কাজে নিযুক্ত না করার কারণগুলি কি তা সরকারের পর্যালোচনা করে দেখা দরকার। গত জানুয়ারি মাসে প্রতিদিনের ন্যূনতম মজুরি ১০০ টাকা করে ধার্য করা হয়েছিল, কিন্তু বর্তমান লেবার কমিশনার এবং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে দিনের এই ন্যূনতম মজুরি ৩০০-৫০০ টাকা হিসাবে ধার্য করেন। যে পঞ্চায়েত গত বছর প্রশংসনীয় কাজ করেছিল তারা এই বছর NREGA-এর কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও কেরল এই তিনটি রাজ্যে দিল্লি স্কুল অফ ইকোনমিকস-এর করা সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় দেখা গেছে, দার্জিলিংয়ের পঞ্চায়েত গত বছরে ২৩ দিনের কাজ সুনিশ্চিত করতে পেরেছিল। অথচ সারা রাজ্যে দিন সংখ্যা মাত্র ১৪। প্রচুর কৃষকের অভিযোগ, তাদের মজুরি পৌঁছুয় দেরিতে। পুরুলিয়ার বাসিন্দা এবং কৃষক তারিক মাহাতোর মতে, সরকার তাদের এই অবস্থার কথা স্বীকার করেছে। গত ২০১০ সালে ৫৬ শতাংশ ক্ষেত্রে কৃষকদের মজুরি দেরিতে পৌঁছেছিল, আর এই বছর ৫৫ শতাংশ— রাজ্য সরকার অবশ্য এই অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছে। কৃষকদের আরও অভিযোগের মধ্যে আর একটি হলো সাত বছর ধরে এই NREGA প্রোগ্রাম চলতে থাকলেও জেলা পঞ্চায়েত এবং ব্লক অফিসের অফিসাররা তাদের কিছু প্রাথমিক কাজের ব্যাপারে যেমন জব প্রসেসিং কার্ড তৈরির ক্ষেত্রে অরাজি।

সূত্র : *টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া*, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩।

সংকলক : **মধুশ্রী দাস**

# কুড়ি ঘণ্টার বেশি টিভি দেখা, বাড়িয়ে দিচ্ছে পুরুষের বন্ধ্যাত্ব

অত্যধিক মাত্রায় টেলিভিশন দেখা আপনার পরিবার পরিকল্পনায় প্রভাব ফেলতে পারে বলে গবেষকরা মনে করছেন। গবেষকরা জানাচ্ছেন যে, যেসব পুরুষ সপ্তাহে ২০ ঘণ্টার বেশি টিভি দেখাতে অভ্যস্ত তাদের মধ্যে শুক্রাণুর সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে হ্রাস পায়। *British Journal of Sports and Medicine* পত্রিকায় প্রকাশিত, এই সমীক্ষায় আরও দেখা গেছে, যে সমস্ত পুরুষরা সপ্তাহে ১৫ ঘণ্টার বেশি শারীরিক ব্যায়াম করেন তাদের শুক্রাণুর সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে ৭৩ শতাংশ বেশি। গবেষকরা দাবি করছেন যে, এই সমীক্ষার ফলাফল ভারতীয় পুরুষদের সচেতন হতে সাহায্য করবে যারা ক্রমশ হ্রাস পাওয়া শুক্রাণুর জন্য বন্ধ্যাত্বের শিকার হচ্ছে।

সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রায় ৭৯ শতাংশ ভারতীয় পুরুষ এবং ৮৩ শতাংশ মহিলা শারীরিক ভাবে নিষ্ক্রিয় এবং প্রায় ৫১ শতাংশ ভারতীয় পুরুষ এবং ৪৮ শতাংশ ভারতীয় মহিলার ক্ষেত্রে অধিক ফ্যাট জাতীয় খাবার তাদের প্রজনন ক্ষমতার উপর ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলছে বলে গবেষকরা মনে করছেন। ২০০৯-২০১০ সালে হার্ভার্ড স্কুল অফ পাবলিক হেলথ্ নিউ ইয়র্ক শহরের ১৮ থেকে ২২ বছর বয়সী ১৮৯ পুরুদের মধ্যে এই সমীক্ষা করেন। যেখানে তারা এই সব পুরুষদের বীর্যের গুণাগুণ এবং তার ওপর তাদের কায়িক শ্রমবিমুখ জীবনের প্রভাব আছে কি না, বা থাকলেও কতখানি তা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে দেখেন।

এই সমীক্ষায় তাদের জিজ্ঞাসা করা হয় গত তিনমাসে তারা দিনের কতক্ষণ সময় ব্যয় করেছে টিভি, ভিডিও বা ডিভিডি দেখে এবং কত সময় তারা ব্যয় করেছে শারীরিক ব্যায়াম করে। তাদেরকে জানানো হয় যে, প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কোনো অসুবিধা বা অন্যান্য স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অসুবিধা, ধূমপান, খাদ্যাভ্যাস তাদের বীর্যের গুণাগুণকে প্রভাবিত করে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, কিছু পুরুষ সপ্তাহে ৫ থেকে ১৪ ঘণ্টা ব্যয় করেন শারীরিক ব্যায়ামের পিছনে এবং কিছু পুরুষ ৪ থেকে ২০ ঘণ্টা টিভি দেখে সময় ব্যয় করেন। গবেষকরা এই সমীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে দাবি করছেন যে, যে সব পুরুষেরা শারীরিক ভাবে সক্রিয় এবং স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত তারা, বেশি টিভি-দেখা পুরুষদের তুলনায় অধিক স্বাস্থ্যবান।

সমীক্ষায় আরও দেখা গেছে যারা দিনে ১৬ ঘণ্টার বেশি শারীরিক ভাবে সক্রিয় তাদের শুক্রাণুর সংখ্যা প্রায় ৭৩ শতাংশ বেশি অন্যান্য পুরুষদের তুলনায়। এবং যেসব পুরুষরা সপ্তাহে ২০ ঘণ্টার বেশি টিভি দেখায় অভ্যস্ত তাদের শুক্রাণুর সংখ্যা ৪৪ শতাংশ কম অন্যান্য পুরুষদের তুলনায়। তবে

গবেষকরা আশ্বস্ত করছেন যে, বীর্যে শুক্রানুর সংখ্যা কমে যাওয়া পুরুষদের প্রজনন ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে না ঠিকই কিন্তু স্বাস্থ্যকর ও শারীরিক ভাবে সক্রিয় জীবনযাপন বীর্যে শুক্রাণুর বৃদ্ধি ঘটায়।

সূত্র : *টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া*, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩।

সংকলক : **পারমিতা চৌধুরী**

## দম্পতি নয় ভাইবোন হয়েই থাকতে হবে, হিসার পঞ্চায়েতের ফতোয়া

হরিয়ানার হিসার গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যরা এক দলিত দম্পতিকে ভাই বোনের মতো থাকার নির্দেশ দিয়েছে। হরিয়ানার ভিতমারা গ্রামের ২৫ বছরের জ্যোতিপ্রকাশ এবং রোহটাকের মেহাম গ্রামের ২০ বছরের প্রিয়াঙ্কা রানি দূর সম্পর্কের ভাই বোন। গত এপ্রিলে তারা ফারনাল কোর্টে গোপনে বিয়ে করেন। বর্তমানে তাদের অভিযোগ বিয়ের পর থেকেই তারা পঞ্চায়েত সদস্যদের থেকে ক্রমাগত হুমকি পেয়ে আসছে প্রাণহানির, বিয়ে ভেঙে দেওয়ার। প্রকাশের বক্তব্য অনুযায়ী গত ৯ মাস থেকে তারা প্রায় একরকম গোপনে দিন যাপন করছেন। বিয়ে করার ঠিক একমাস পর মে মাসে যখন তারা ভিতমারা গ্রামে ফেরে তখন থেকেই পঞ্চায়েত সদস্যরা বিশেষ করে পঞ্চায়েত প্রধান বালসের সিং তাদেরকে বিয়ে ভেঙে ভাই বোনের মতো থাকতে নির্দেশ দেন এবং প্রাণহানির হুমকিও দেন। এই ঘটনার পর প্রকাশ কার্যত ভয় পেয়ে বাড়ি ছেড়ে দেন এবং উকলানা গ্রামে একটি বাড়ি ভাড়া করে সস্ত্রীক থাকতে শুরু করেন। কিন্তু তাতেও হুমকি আসা বন্ধ হয় না।

প্রকাশ আরও জানিয়েছেন যে, বিয়ের পর তারা কেবল ৩ মাসই নিরুপদ্রবে কাটাতে পেরেছেন। গত বৃহস্পতিবার, প্রকাশ হিসার-এর ইন্সপেক্টর জেনারেল এস সি চক্রবর্তী-র কাছে যান এবং তার কাছে সব কথা খুলে বলেন। ইন্সপেক্টর জেনারেল চক্রবর্তী তাকে আশ্বস্ত করেন যে, তিনি এ বিষয়ে পূর্ণ তদন্ত করবেন এবং প্রয়োজনে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবেন। অন্যদিকে পঞ্চায়েত প্রধান সিং এই অভিযোগকে অস্বীকার করেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে পঞ্চায়েত এর ওপর আনা এই অভিযোগকেও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন।

সূত্র : *টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া*, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩।

সংকলক : **মধুশ্রী দাস**

রিপোর্ট

## EIMF-এর বিশ্ব এইড্‌স দিবস উদ্‌যাপন

গত ১ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে ইস্টার্ন ইন্ডিয়া মিউজিক ভিডিও অ্যালবাম মেকার্স ফোরাম তার কলকাতাস্থিত কার্যালয়ে বিশ্ব এইড্‌স দিবস উদ্‌যাপন করে। এই দিন সংগঠন একটি এইড্‌স সংক্রমণ সংক্রান্ত বিষয়ে জন সচেতনতামূলক সেমিনারের আয়োজন করে। এই সেমিনারে সংগঠনের ২০ জন সদস্য-সদস্যা অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন রাজ্যের সমাজকর্মীরাও এই সেমিনারে তাদের বক্তব্য রাখেন। সেমিনারটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সংগঠনের সভাপতি এবং সমাজকর্মী শ্রী শিবাশিস দত্ত। সেমিনার শেষে ছিল প্রশ্নোত্তর পর্ব। এই প্রশ্নোত্তর পর্বে অনুষ্ঠানে আপাত সাধারণ মানুষেরা তাদের কৌতূহল নিরসনের জন্য নানান প্রশ্ন করেন এবং বিভিন্ন বক্তার কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উত্তর পেয়ে সন্তুষ্ট হন।

অনুষ্ঠান শেষে সভাপতি সকলের কাছে আবেদন রাখেন 'এইচআইভি পজিটিভ আক্রান্ত ব্যক্তিদের কখনও ঘৃণার চোখে দেখবেন না। তাদের সর্বদাই সহানুভূতির চোখে দেখবেন। সমাজের মূলস্রোতে মেশবার জন্যে তাদের অগ্রাধিকার দেবেন। সঠিক ওষুধ, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা এবং শুশ্রূষা পেলে তারা নিশ্চয়ই সুস্থ হয়ে উঠবেন।' সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটির ভিডিও রেকর্ডিং করে 'ওয়ান আই মুভিস' সংস্থা।

**সোনালিকা সেন**


**DURBAR : A Brief Profile** **100**

মৃণালকান্তি দত্ত

**বৃহন্নলাদের জীবনসত্য** ১০০ টাকা

স্মরজিৎ জানা

**টনিক নামে ভেলকি** ৪৫ টাকা

শুভেন্দু দাশগুপ্ত, স্মরজিৎ জানা সম্পাদিত

**অধিকার ভাবনা** ৮০ টাকা

স্মরজিৎ জানা

**চেনা দেশ অচেনা মানুষ** ২০০ টাকা

স্মরজিৎ জানা সম্পাদিত

**ভাঙে যেন** ৬০ টাকা

স্মরজিৎ জানা, মৃণাল কান্তি দত্ত সম্পাদিত

**কখনও জিৎ কখনও হার** ৩০০ টাকা

মৃণালকান্তি দত্ত

**যৌনকর্মীদের জীবনসত্য** ১০০ টাকা

মৃণালকান্তি দত্ত

**বাবুদের অন্দরমহল** ৪০ টাকা (নিঃশেষিত)

স্মরজিৎ জানা

**জীবন, যৌনতা ও যৌনকর্মী** ৮০ টাকা

দীপক বড়পাণ্ডা

**নাচনির কথা** ৬০ টাকা

তরুণ বসু

**ভিন্ন নারী অন্য স্বর** ৪০ টাকা

তরুণ বসু, ভারতী দে সম্পাদিত

**নারী ভাবনার বাইশ কথা** ১০০ টাকা

স্মরজিৎ জানা

**সমাজ সমস্যার সাত-সতেরো** ১৯৫ টাকা

**Only Rights can Stop the Wrong...** 50

**আন্দোলনের কথা** ... ... ১৫০ টাকা

**শ্রমিকের অধিকার চাই** ... ... ৩০ টাকা

**আমাদের শরীর ও যৌন রোগ** ৪০ টাকা

**The Fallen Learn to Rise** ২০ টাকা

Pradip Bakshi

**A Note on the Reconstruction** ২৫ টাকা

**অন্ধকারের উৎস হতে** ২০ টাকা

দুর্বার প্রকাশনী

৪৪ বলরাম দে স্ট্রিট,

কলকাতা ৭০০ ০০৬

ফোন : ০৩৩ ২৫৩০ ৬৬১৯/৩১৪৮

ফ্যাক্স : ০৩৩ ২৫৪৩ ৭৭৭৭

মেল : sonagachi@sify.com

ওয়েবসাইট : www.durbar.org

# কলকাতা মিলন মেলার বই মেলায়

তরুণ বসু

ছিল বারো দিনের মেলা, হলো ষোলো দিন— জনান্তি বলছে, মুখ্যমন্ত্রীর আদেশ, বা অন্য কিছু। মেলার ক্যালেন্ডার অনুযায়ী শুরুর ঘোষিত দিন ছিল ৩০ জানুয়ারি ২০১৩। চার দিন আগে বাড়ার ফলে শুরু হলো ২৬ জানুয়ারি ২০১৩। মানে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলো। কিন্তু ছোটো প্রকাশকরা, যাদের কথা ভেবে দিন বাড়ল, তাদের হালত্ কি হলো।

আসলে সব জায়গাতেই ছোটোরা চিরকালই প্রান্তিক। প্রকাশকদের ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় হবে কেন? এমনিতেই তাদের পান্তা আনতে নুন ফুরোয়। তার উপর চার দিন বাড়ায় গিলড্, ডেকরেটার সবাই বাড়তি দাম হাঁকিয়ে দিয়েছে। ফলে মেলা সংক্রান্ত তাদের বাজেটের অবস্থা একেবারে ভারত সরকারের মতো, চিরকালের ঘাটতি। এদিকে তেল মাখতে হলে তো কড়ি ফেলতেই হবে। তাই থোড় কেটে বড়ি, বড়ি কেটে থোড়। তা যাক গে। মেলার স্টল, লটারি হেনাতেনা মেটার পর শুরু জুতোর মাপে পা ধরানো। যেমন ডেকরেটার লাগবে যেন ঠিক বামুনের গোরুর মতো, খাবে কম দুধ দেবে বেশি। আর এই খুঁজেপেতে যাকে ধরা হলো তার জানলার আধখানা কাঁচ আছে তো বাকি আধখানা পাওয়া যাবে সাতদিন পর, গেট মিলবে তিনদিন পর, নাহলে— না, হ্যাপা এইখানে শেষ নয়। আরও আছে। ২৫ জানুয়ারি মেলার মাঠে ডেকরেটারের অস্থায়ী শ্রমিক ধরে প্রকাশকের টানাটানি, এক্ষুণি আমাদের স্টল কমপ্লিট করে দাও। সে-বেচারার এই সময় মালিকের প্রতিনিধি হিসেবে একটু ক্ষমতায়ণ ঘটে। সে জানে মেলার কদিন পেরোলে এরাই আর চিনতে পারবে না কেউ। তাই একটু দর নিয়েই বলে আপনি যান আমি একটু বাদে আপনার স্টলে আসছি। কিন্তু এরই মধ্যে আরও একজন স্টল মালিক হাজির এবং তারও একই বক্তব্য। সবাই-এর টানাটানিতে তখন ক্ষমতায়ণের স্বাদ তার তিতো লাগে— মালিকের শেখানো বুলির পুঁজি তো আর প্রকাশকের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো শক্তিশালী নয়। আর মূল মালিকও তো ত্রিসীমানায় নেই, আছে তার ফোন-টিক নির্দেশ। এত সবের পরে ২৬ জানুয়ারি মেলার উদ্বোধন দিনে কেবল বড়ো প্রকাশকরাই, মানে অক্সফোর্ড, কেমব্রিজরাই পারল গুছিয়ে বসতে। কিন্তু যাই হোক বাবা, মেলার দিন তো বাড়ল!

না, আমরাও ২৬ তারিখ মেলায় বইপত্তর সাজিয়ে বসতে পারিনি, গেট লাগায়নি ডেকরেটার। তবে আমরা নই একা, বেশির ভাগ প্রকাশকরাই এবার ২৮ তারিখ মঙ্গলবারের আগে গুছিয়ে বসতে পারেনি। আর গিলড্ ৩০ তারিখের আগে মেলার শুরু কখন শেষ কখন সেই ঘোষণাই করল না। কারণ জানা না গেলেও লোকে বলে, মুখ্যমন্ত্রীর কথায় মেলার দিন বাড়ানো হলো বটে কিন্তু সরকারি ভাবে আন্তর্জাতিক তকমাটা আর থাকে না। কারণ এই মেলার ক্যালেন্ডার ঠিক হয়ে আছে 'ওয়ালর্ড বুক ফেয়ার' ক্যালেন্ডারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এই ঠিক হওয়া তারিখ অদল-বদল করতে পারে না। অবশ্য দুষ্ট লোকে রটিয়ে দিয়েছে যে, কলকাতা আর আন্তর্জাতিক মেলা নেই। যেবার মেলা ময়দানে বন্ধ হয়ে গেল সেবার থেকে এর আন্তর্জাতিক তকমাটা খসে গেছে। তবে আমরা আছি কলকাতেই— কি আছে আর কি নেই সে জাহাজের খবরে আদার ব্যাপারি মাথা ঘামাক গে, আমরা বরং থাকি মেলাতেই।

আমরা, মানে দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি, দুর্বার প্রকাশনী আর দুর্বার ভাবনা, ২৭ তারিখ বিকেল থেকে গুছিয়ে বসতে পেরেছিলাম। পরের দিনই বেশ ভালো ভিড় হলো। অবশ্য মেলায় প্রতিদিনই ভিড় হয়েছে কিন্তু বেশ কয়েকজন প্রকাশকের কাছে শুনেছি তাদের বিক্রির হার খুবই কম। যেমন ভাষাবন্ধন-এর স্টল দেখলাম প্রায় ফাঁকা। 'চর্চাপদ' বা 'নাগরিক মঞ্চ'-রও স্টল প্রায়শই দেখেছি ফাঁকা। তাঁদের বইপত্র বিক্রির হারও আশানুরূপ নয়।

মেলা মানে হুজুগ। সেই যে কবে শুরু হয়েছিল তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে, গাজন-দেল-দোল-দুর্গোৎসব-বারোইয়ারি পেরিয়ে হুতোমের কালও শেষ হয়ে গেছে। শুরু হয়েছে নতুন মেলা-হুজুগের দিন, তার মধ্যে বই মেলা অন্যতম। এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা নাকি এবার মেলা-মুখী। বই দেখছে কি দেখছে না তার থেকেও হাজির যে হচ্ছে সেই তো ভালো লক্ষণ, অন্তত পঞ্চাশোর্ধরা একটু স্বস্তি পেতে পারবেন।

কোনো বিষয়ে প্রতিবাদ মঞ্চ হিসেবে এই মেলার একটা বেশ ভালো কার্যকারিতা আছে। সেই কারণে সোনি সোরি মুক্তি মোর্চার পক্ষ থেকেও ৯ ফেব্রুয়ারি, মেলার শেষ দিনের আগের দিন, একটি প্রতিবাদী মৌন মিছিলের পরিকল্পনা করা হয়।

ছত্তীসগঢ়ের দান্তেওয়াড়ার স্কুল শিক্ষিকা সোনি সোরিকে বিনাবিচারে রায়পুর জেলে (সে-সময় সোনি রায়পুর জেলে বন্দি ছিলেন, পরে তাঁকে দান্তেওয়াড়ায় বদলি করা হয়) প্রায় দেড় বছর ধরে বন্দি করে রাখা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত তাঁর কেস কোনো আদালতে তোলা হয়নি। তাঁর শারীরিক অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটছে। বন্দি সোনির উপর ক্রমাগতই যৌন নির্যাতন চালানো হয়েছে। দোষী পুলিশ অফিসার অঙ্কিত গর্গ পেয়েছে শৌর্যবীর্যের রাষ্ট্রপতি পুরস্কার। এই অঙ্কিত গর্গের শাস্তি দাবি করে, সোনি সোরির মুক্তি চেয়ে মেলায় মিছিল। প্রথমে লোকজন প্রায় কেউই ছিলেন না দুর্বারের দিদিরা ছাড়া, তারপর একে একে এলেন বন্দি মুক্তি কমিটি, মেডিকেল কলেজের ছাত্র এবং অন্যান্যরা। তবে মিছিলের শুরুতেই বিপত্তি, পুলিশ মিছিল করতে দেবে না। মিছিলের পারমিশান আছে কিনা, কতৃপক্ষের অনুমতি আছে কিনা ইত্যাদি বলে জিজ্ঞাসার শুরু। তারপর অবশ্য অনুমতি মিলল এবং মিছিলও হলো। চলতে চলতেই অনেক নতুন মুখ সঙ্গী হলো। অনেকেই সোনি সোরি সম্পর্কে জানতে আগ্রহ দেখাল। আবার অনেকেই সংগ্রহ করলেন মোর্চার প্রকাশিত পুস্তিকা 'এ লজ্জা ঢাকব কোথায়'।

১০ জানুয়ারি রবিবার, 'আসছে বছর দেখা হবে' বলে রাত ৯টায় মানুষের ঢল পরিচিত গন্তব্যে হাঁটা লাগাল। □

# পৃথিবীর আদিমতম ভণ্ডামো

মাঝে মাঝেই মনের কোণে প্রশ্ন ওঠে, সভ্যসমাজের অগণিত ভণ্ডামোর মধ্যে চরমতম ভণ্ডামোটি কি? অনেক ভেবে দেখেছি, চরমতম ভণ্ডামোটি হলো পতিতালয়ের প্রতি আধুনিক সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি। প্রথমে, 'পতিতালয়' নামটি দিয়েই শুরু করা যাক বরং। পতিতালয়— মানে পতিতার আলয় অর্থাৎ পতিতার আবাসস্থল। এখন প্রশ্ন হলো, পতিতা কে? সাধারণ দৃষ্টিতে সেই পতিতা যে অর্থের বিনিময়ে পুরুষ নির্বিশেষে দেহদান করে। আমরা তাহলে দেখতে পারছি যে এহেন পতিতাদের কাছে যায় পুরুষেরা। প্রশ্ন উঠতেই পারে, পতিতার কাছে যায় যে পুরুষ, তাকে কি 'পতিত' বলে অভিহিত করে সমাজ? কারণ, সেই পুরুষটিও তো শুধুমাত্র অর্থদান করে একটি নারী শরীর ভোগ করছে। আরেকটি প্রশ্ন একই সঙ্গে উঠে আসে মনে, তা হলো, কিসের থেকে এই পতন? পতিতা নারীটির পতন কি সমাজের চোখে, নাকি নিজের চোখে, নাকি মূল্যবোধের দৃষ্টিতে? যদি সেই পতন নিজের চোখে হয়, তবে সেটা একান্তই তার ব্যক্তিগত বিষয়, তার জন্য সমাজ তাকে কোনো আখ্যা দিতে পারে কি? যদি সমাজ বা মূল্যবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে পতন ঘটে থাকে, তবে আবার সেই আগের প্রশ্নটিই উঠে আসে যে, কেবল নারীটির পতন এতে সূচিত হচ্ছে কেন, পুরুষটি ছাড় পাচ্ছে কোন্ যুক্তিতে? এখানে আরও একটি বড়ো প্রসঙ্গ আছে বলে মনে হয়। একটি মানুষ, সে নারী-পুরুষ যাই হোক না কেন, তার দেহের মালিকানা তার একান্তই ব্যক্তিগত। কোনো মানুষের দেহের মালিকানা অন্য কেউ বা কোনো সমাজ দাবি করতে পারে না। প্রকৃতি সৃষ্ট দেহে, দেহটি যার, সে ছাড়া অন্যের দাবি হাস্যকর। তবে, সেই মানুষটির পূর্ণ স্বাধীনতা আছে তার নিজের দেহ নিয়ে যা খুশি করবার। তাতে যদি কোনো নারীর ইচ্ছা তাকে সহস্র পুরুষের সঙ্গে শয্যা ভাগ করতে বলে, সেই কারণে তাকে দেগে দেওয়া অনুচিত।

একটু আগে 'নিষিদ্ধপল্লি' কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে। এই নামকরণটিই প্রমাণ করে সমাজ কতটা ভণ্ড! একটি নির্দিষ্ট পল্লিকে 'নিষিদ্ধ' নাম দেওয়া হচ্ছে, অথচ সমাজ, প্রশাসন সেটা চলতেও দিচ্ছে অক্লেশে। যদি ওই নির্দিষ্ট পেশা বা পল্লি নিষিদ্ধই হবে, তবে প্রশাসন তা বন্ধ করবার চেষ্টা করে না কেন? সরকার তো ইচ্ছা করলেই যথোচিত পদক্ষেপ নিয়ে দেখতে পারে সমীক্ষা করে যে যত মেয়ে ওখানে আছে, তারা কতজন নিজের ইচ্ছায় আছে, কতজন অন্যের দ্বারা বাধ্য হয়ে। যারা নিজের ইচ্ছায় আছে, তাদের পেশাটাকে স্বীকার করে নেওয়া হোক, যথোচিত মর্যাদা দেওয়া হোক, আর যারা বাধ্য হয়ে আছে, তাদের মুক্ত করা হোক, সামাজিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হোক। সামান্যতম সদিচ্ছা থাকলে কোনো সরকারের পক্ষে এটা করা খুব কঠিন কাজ তো নয়। কঠিন হলে, নানা সমাজসেবী সংগঠনেরা এই জাতীয় প্রয়াসে ব্রতী হচ্ছেন কিভাবে? আচ্ছা, ভেবে বলুন তো, কোনো রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইস্তাহারে এই মেয়েদের নিয়ে একটিও অক্ষর থাকে কিনা! থাকে না। অথচ সমাজের খেটে খাওয়া, মেহনতী মানুষদের কথা ভুরি ভুরি থাকে। এই মেয়েরাও কি সেই খেটে-খাওয়াদের দলেই পড়ে না? যে মেহনত এদের দেহকে সহ্য করতে হয় প্রতিদিন, তা খুব কম পেশার মানুষদেরই সহ্য করতে হয়। একটু ভাবুন তো, একটি ষোলো-সতেরো বছরের কিশোরী যথাসম্ভব উত্তেজক পোশাক পরে (যদিও উত্তেজক পোশাক বলে কিছু হয় না, ওটা সমাজের বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গির বচন, তা না হলে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট মাঠে ভুরি ভুরি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে যেতে পারত), একগাদা অপ্রয়োজনীয় রঙে নিজের ত্বককে কষ্ট দিয়ে সন্ধ্যার ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছে। কি তার লক্ষ্য? চোদ্দ থেকে চুরাশি বছরের যে কোনো পুরুষের নজরে পড়া, যাতে দেহদান করে সে দুটো অর্থ রোজগার করতে পারে, যে অর্থের সবটার উপর আবার তার অধিকার নেই, বেশির ভাগটাই দালাল-গুণ্ডাদের পকেটস্থ হবে। রাত বাড়ছে, মেয়েটির উদ্বেগও। কোনো মানুষ না জুটলে সে খাবে কি? রাত বাড়ছে নিজের দেহের দর নামাচ্ছে মেয়েটি যাতে কিছু অর্থ অন্তত জোটে। একবার ভাবুন তো মেয়েটির কথা! সত্যিই কি আর ঘৃণা হচ্ছে ওকে? আপনার ঘৃণা কি ওর আদৌ প্রাপ্য না কি আপনি যে সমাজে বাস করেন, যে সমাজ সব জেনেশুনেও ওই মেয়েটিকে তার অসহায়তা থেকে উদ্ধারের কোনো গভীর সদর্থক চেষ্টা চালাচ্ছে না, সেই সমাজের প্রাপ্য ওই ঘৃণা? কে পতিত আদতে? ওই মেয়েটি নাকি এই ভদ্র সমাজ?

ভাবতে গেলেই নিজের আঙুলগুলো নিজের দিকেই তাক করে আসে। অতএব তার অনেক হ্যাপা। নিজের বিবেককে উত্তর দেওয়ার হ্যাপা, ওই মেয়েগুলির জন্য সত্যিই কিছু করবার হ্যাপা, ওই হতভাগ্য মেয়েগুলিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে আমাদের সঙ্গে একাসনে বসানোর হ্যাপা! তার চেয়ে এই ভালো। অনেক সহজ ওদের গায়ে 'পতিতা' অ্যাখ্যা দিয়ে দেওয়া, অনেক ভালো ওদের 'নষ্টা' বলা, না হলে নিজেদের সমাজকেই পতিত, নষ্ট, ভণ্ড বলে স্বীকার করতে হয় যে! তাতে যে নিজেরও গায়ে কালি লেপে যাওয়ার আশঙ্কা! তার চেয়ে এই ভালো! অনেক ভালো সন্ধ্যায় বাস করে ফিরতে ফিরতে পতিতালয়ের সামনে দাঁড়ানো মেয়েগুলির অর্ধউন্মুক্ত দেহ দেখে তৃপ্ত হয়ে বাড়ি ফিরে রাত্রে স্ত্রী-র পাশে বাধ্য স্বামীটির মতো শুয়ে পড়া। তাই না?

**সৌমিত্র চক্রবর্তী**
হাওড়া।